দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

প্রথম বর্ষ • ৭ ম সংখ্যা • ১ জুলাই ২০২৪

ভিতরের পাতায়

১) ভোটের রায় ঃ বিজেপির ব্যর্থতার প্রতিফলন ২
২) সাত বছরে সত্তরটি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস ৩
৩) পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থার বিপর্যয় কেনো ৭
৪) দেশে পরাজিত মোদি, বঙ্গে বামপন্থীরাও (শেষাংশ) ৮
৫) ওয়ার্ক পারমিট বাতিল ঃ দ্বিতীয় ফরাসি সাংবাদিক এই দেশ ছাড়লেন ১০
৬) কুকিরা মনিপুরের সঙ্গে থাকতে চায় না। ১১
৭) নাগাল্যান্ডের সাম্প্রতিক অবস্থা ১২
৮) ব্রাত্য পরিবেশ কথা ১৫
৯) শাসকের সঙ্গে সংঘাত ও বিচারালয়ের বাড়াবাড়ি ১৭
১০) 'নাগরিক' স্মৃতিচারণা ঃ বিস্মৃত প্রকৃতিবিদ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ২০
১১) শ্রদ্ধাঞ্জলি ঃ চলে গেলেন কলকাতাপ্রেমী পিটি নায়ার ২২
১২) ৭৫ বছরে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি ২৩
১৩) নবাব সিরাজদ্দৌলা ও পলাশী লুণ্ঠন ২৬

সম্পাদক

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন ৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

ই মেইল : nagorik0240@gmail.com

ফোন : 80178 04019 / 94340 22512

নরেন্দ্র মোদীর মনোভাব অপরিবর্তনীয়

অষ্টাদশ লোকসভার প্রারম্ভিক অধিবেশনে নরেন্দ্র মোদী স্পিকার ওম বিড়লাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছেন তিনি সপ্তদশ লোকসভা নিরলস দক্ষতা ও কঠোরতার সঙ্গে পরিচালনা করেছেন ও গত লোকসভা শতকরা ৯৭ ভাগ কাজ করেছে। সকলেই জানেন গত লোকসভা কিভাবে পরিচালিত হয়েছে। বিনা আলোচনায় এক দিনের মধ্যে অসংখ্য জনবিরোধী, অগণতান্ত্রিক ও সংবিধানের মৌলিক নীতির পরিপন্থী বিল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে পাশ করানো হয়েছে। ১৪৬ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করে সভা চালানো হয়েছে। বিরোধী দলের নেতা রাহুল গান্ধী বলেন প্রশ্ন হল সংসদে ভারতের স্বর শোনা যাচ্ছে কি না। প্রশ্ন এটা নয় যে কে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করে দক্ষতার সঙ্গে সংসদ চালাতে পারেন, এটা অ-গণতান্ত্রিক ভাবনা। অন্য বিরোধী নেতৃবৃন্দ অখিলেশ যাদব, সুদীপ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দও বলেছেন স্পিকারের ইশারায় লোকসভা চলুক। অন্যরকম যেনো না হয়। বিরোধী সদস্যদের বারবার সাসপেন্ড করে যেনো সংসদের মর্যাদাহানি না করা হয়।

কিন্তু দেখা গেলো বিজেপির মনোভাবের কোনও পরিবর্তনই হয় নি। নরেন্দ্র মোদী অনাবশ্যক ভাবে ৫০ বছর আগের ১৯৭৫ এর জরুরি অবস্থা জারির কথা উল্লেখ করে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংবিধান লঙ্ঘনের অভিযোগ করেন। আশ্চর্য বিষয় , এর পরই সারি দিয়ে স্পিকার ওম বিড়লা থেকে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মু (লিখিত ভাষণ) সকলেই মোদীর ভাষণের পুনরাবৃত্তি করেন। শ্রী বিড়লা একথাও বলেন তিনি সভায় বিরোধীরা কী বলছেন তা মাথায় রাখবেন। তিনি অসংখ্য পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে শাসক দলের ইঙ্গিতে আলোচনা করতে না দিয়ে সভা মুলতুবি করে দেন।

ভোটের রায় ঃ বিজেপির ব্যর্থতার প্রতিফলন

সৌর বসু

২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের দেশের যে দুটি রাজ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি লোকসভা আসন রয়েছে, উত্তর প্রদেশ এবং মহারাষ্ট্র, ভারতীয় জনতা পার্টি এই দুটি রাজ্যে সর্বাপেক্ষা খারাপ ফলাফল করেছে।

উত্তর প্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের সাধারণ মানুষ বিজেপির বিভাজন মূলক প্রচারকে এবার প্রত্যাখ্যান করেছে। তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় উত্তরোত্তর মূল্যবৃদ্ধি এবং কর্মহীনতা ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। তার প্রতিফলন ঘটেছে এবারের নির্বাচন।উত্তরপ্রদেশে লোকসভাতে মোট আসন সংখ্যা ৮০। উত্তরপ্রদেশে বিগত দুটি লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি যথাক্রমে ৭১টি এবং ৬২টি আসনে জয়লাভ করেছিল। ২০১৯ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি উত্তরপ্রদেশে ৪৯ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। ২০১৪ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি পেয়েছিল ৪২ শতাংশ ভোট। ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি পেয়েছে ৩৩ টি আসন এবং ৪১ শতাংশ ভোট।

অর্থাৎ উত্তর প্রদেশে ২০১৯ এর তুলনায় বিজেপির ভোট ৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে আসন সংখ্যা প্রায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। মহারাষ্ট্রেও বিজেপি ৪৮ টি আসনের মধ্যে ২০২৪ এর নির্বাচনে মাত্র ৯টি আসন জিততে সক্ষম হয়েছে। ভোট পেয়েছে ২৬ শতাংশের কিছু বেশি। বিগত ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে মহারাষ্ট্রে বিজেপির আসন সংখ্যা ছিল ২৫ এবং ভোটের শতাংশ ছিল ২৭ এর কিছু বেশি। নরেন্দ্র মোদির ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে প্রচারের বিষয়বস্তু ছিল মূলত সংখ্যালঘু মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষোদগার। সংখ্যালঘু মুসলিমদের তিনি অনুপ্রবেশকারী আখ্যা দিয়েছেন। কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে হিন্দু মহিলাদের সোনা, মঙ্গলসূত্র কেড়ে নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে সব বিলি করে দেবে বলে তিনি প্রচার করেন। মোদী বলেন ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং নাকি ঘোষণা করেছিলেন যে সম্পদের উপর মুসলমানদের প্রথম অধিকার। এছাড়াও তিনি বলেন কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে হিন্দুদের গরু মোষ থাকলে একটা করে গরু সব পরিবার থেকে কেড়ে নেবে। এগুলো সর্বৈব মিথ্যা। সম্প্রতি আরএসএসের সরসংঘ চালক মোহন ভগবত ঘোষণা করেছেন যে ভারতবর্ষ একটি বহুত্ববাদী রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গেলে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে। ভারতের সংস্কৃতিতে অহঙ্কারের কোন স্থান নেই। মোহন ভগবতের এই বক্তব্যের গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। তিনি কি নরেন্দ্র মোদিকে সাবধান করে দিচ্ছেন। বিগত ১০ বছর নরেন্দ্র মোদী দেশের শাসন ব্যবস্থায় একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি হয়ে উঠেছিলেন সর্বময়কর্তা। শুধু বিগত ১০ বছর নয় গুজরাটেও তিনি যতদিন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শাসন কার্য পরিচালনা করেছিলেন, সেখানেও তিনিই ছিলেন শেষ কথা। এবারের নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির ভরাডুবি হয়েছে বলা যায়। নির্বাচনের মূল কর্ণধার ছিলেন নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টি ৩৭০ আসন পাবে। কিন্তু সেখানে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ২৪০ আসনে থেমে যেতে হল। পরিসংখ্যান বলছে নরেন্দ্র মোদী যেসব কেন্দ্রে নির্বাচনী বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার ৫০% আসনে বিজেপি পরাজিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে তিনি ২৪ টি কেন্দ্রে নির্বাচনী সভা করেছেন তার মধ্যে ২০টিতেই বিজেপি পরাজিত হয়েছে। তার নিজস্ব কেন্দ্র বারাণসীতে তিনি এবার এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ভোটে জয়লাভ করেছেন। বিগত ২০১৯ সালে তিনি জয় লাভ করেছিলেন ৪ লক্ষ ৭৪ হাজার ভোটে।

বিগত২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদী বারাণসীতে পেয়েছিলেন ৬৩ শতাংশর বেশি ভোট। এবারের লোকসভা নির্বাচনে তার ভোটের শতাংশ কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৫৬.৩৭। গঙ্গার দত্তক পুত্রের বারানসীতে এই হাল নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

নরেন্দ্র মোদির সম্প্রদায়িক বিষবাষ্প সমন্বিত প্রচার এবার সাধারণ মানুষের মনে দাগ ফেলতে পারেনি। মূল্যবৃদ্ধি এবং কর্মহীনতা সাধারণ মানুষকে আশঙ্কিত করে তুলেছে। আর্থিক নিরাপত্তার অভাব বোধ তাদের মনে ভীতির সঞ্চার ঘটিয়েছে। নরেন্দ্র মোদি র অর্থনৈতিক নীতির ব্যর্থতা এবারের নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির পরাজয়ের অন্যতম কারণ।

বিগত ১০ বছর নরেন্দ্র মোদি বিজেপির এজেন্ডা হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, সেই লক্ষ্যে কাজ করেছেন। তার শাসনকালে গণতান্ত্রের পরিসর সংকুচিত হয়েছে, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র বিনষ্ট হয়েছে। সংসদের পবিত্রতা রক্ষিত হয়নি। ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামো বারবার আক্রান্ত হয়েছে। সংবিধানকে উপেক্ষা করে ভারতের একমাত্র মুসলিম প্রধান রাজ্য জম্মু ও কাশ্মীর ভেঙে দিয়ে দুটি ইউনিয়ন টেরিটোরি গঠন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা, এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট কে কুক্ষিগত করে বিরোধীদের হেনস্থা করা হয়েছে। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের আগে দুটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

এ ঘটনা নজীর বিহীন।হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগকে ব্যবহার করা দুর্ভাগ্যজনক। ভারতের বিচার ব্যবস্থা ছিল পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিচার ব্যবস্থা।নরেন্দ্র মোদির শাসনকালে বিচার ব্যবস্থার মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছে।

ভারতের নির্বাচন কমিশন এবং বিচার ব্যবস্থা এবারের নির্বাচনে বিজেপির বিদ্বেষ মূলক ভাষণের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হয়নি। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতীয় জনতা পার্টি তথা নরেন্দ্র মোদির কাছে আত্মসমর্পণ করে বসেছিল। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামো এবং গণতন্ত্রের পক্ষে তা অত্যন্ত বিপদজনক।

এখন যে প্রশ্নটা সামনে উঠে এসেছে তা হল এই দুর্বল বিজেপি সরকার কি পারবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ? ভারতের ধর্ম নিরপেক্ষ কাঠামোর ভিতকে এই সরকার আরো দুর্বল করে তুলতে সক্ষম হবে? এক্ষেত্রে বিরোধীদের একটা বড় ভূমিকা থেকে যায়। এবার কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইন্ডিয়া জোট ভালো ফলাফল করেছে।কংগ্রেস একক ভাবে বিগত লোকসভা নির্বাচনের ৫২ টি লোকসভা আসনে জয়ী হয়।এবার কংগ্রেস ৯৯ টি আসনে জয়ী হতে সমর্থ হয়েছে। নিঃসন্দেহে বিগত একবছর ধরে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের ভূমিকা এবং ইন্ডিয়ার জোটভুক্ত দলগুলোর ভূমিকা ভারতীয় জনতা পার্টিকে একটা বড় ধাক্কা দিতে পেরেছে।

রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা, কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর এবং মনিপুর থেকে মুম্বাই সাধারণ মানুষের কাছে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দিয়েছে ।ভারত একটি বহুত্ববাদী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র।ভারতীয় জনতা পার্টির ধর্মীয় বিভাজনের বিপরীতে এই কর্মসূচি অত্যন্ত জরুরি ছিল। পাশাপাশি ভারতের বহুত্ববাদী চরিত্রকে রাজনীতির পরিসরে ফিরিয়ে আনতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে এই কর্মসূচি।

এ কথা স্মরণে রাখা অত্যন্ত জরুরি যে সংখ্যালঘু ভারতীয় জনতা পার্টি ,সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মীয় বিভাজনের লক্ষ্যে তাদের কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সচেষ্ট থাকবে।বিজেপির এই কর্মসূচিকে প্রতিহত করা, বিরোধী পক্ষের এখন সব থেকে বড় একটি চ্যালেঞ্জ।

বিরোধী শক্তির অন্যতম কর্তব্য অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি এবং প্রান্তিক মানুষদের জন্য সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি সঠিকভাবে রূপায়ণের জন্য চাপ সৃষ্টি করা, সাংবিধানিক মূল্যবোধ এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করা।

মনে রাখতে হবে২০২৪ এর নির্বাচন বিজেপির অর্থনৈতিক ব্যর্থতা এবং সামাজিক বিভাজনের বিরুদ্ধে রায়দান করেছে।সাধারণ মানুষের এই বার্তা কে প্রয়োজনীয় প্রতিশ্রুতি প্রদান করা এখন আসু প্রয়োজন।

সাত বছরে সত্তরটি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস

অমিতাভ সিংহ

গত ৭ জুনের দেশের বেশ কিছু সংবাদপত্রের পাতাজোড়া একটি বিজ্ঞাপনে চোখ আটকে গিয়েছিল।বিজ্ঞাপনটি ছিল ‘অ্যালেন’ নামে একটি কোচিং সেন্টারের। তারা কিছু বালক বালিকার ঝকঝকে ছবি ছাপিয়ে দাবী করেছিল যে তাদের সংস্থা থেকে ডাক্তারি প্রবেশিকা বা নিট ইউজি অথবা ন্যাশান্যাল এলিজেবিলিটি ও এন্ট্রান্স টেস্ট পরীক্ষায় ২৬ জন সর্বভারতীয় ১ নং র‍্যাঙ্ক করেছে যার মধ্যে তিনজন কলকাতার, এই তালিকায় আছে। এরা সবাই ৭২০ নম্বরের মধ্যে পুরো ৭২০ নম্বর পেয়েছে। তাছাড়া দেশের প্রথম ১০০ জনের মধ্যে ৪০ জনই এই সংস্থা থেকে কোচিং নিয়েছে। এমনকি যোগ্যতা মান পার হওয়া ১৩৮৪১৬ জন এই সংস্থারই ছাত্র ছাত্রী। সেদিনই আরেকটি কোচিং এর সংস্থা ‘আকাশ’ বিজ্ঞাপন দিয়ে

দাবী করে তাদের সংস্থায় ছাত্রদের মধ্যে ১৪ জন (ক্লাসরুম) ও ৭ জন (দূরশিক্ষা) অর্থাৎ মোট ২১ জন সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে দেশের মধ্যে টপার হয়েছে। ৩৬ জনের স্থান হয়েছে প্রথম ১০০ জনের মধ্যে ও মোট ১১৪৩৭১ জন যোগ্যতামান পেরিয়েছে তাদের কাছে কোচিং নেওয়া ছাত্র ছাত্রীরা।

এই পরীক্ষাটিতে পরীক্ষার্থীদের চারটি বিষয়ে ৪৫ টি করে মোট ১৮০ টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হয়। প্রতিটি সঠিক উত্তরের জন্য চার নম্বর এবং ভুল উত্তরের জন্য এক নম্বর কাটা হয়। ফিজিক্স বা পদার্থবিদ্যা, কেমিস্ট্রি বা রসায়ন, জীববিদ্যা বা জুলজি ও উদ্ভিদবিদ্যা বা বোটানি এই চার বিষয়ে প্রশ্ন থাকে। যদি কোন পরীক্ষার্থী একটি উত্তর ভুল লেখে তাহলে তার পাঁচ (৪+১) নম্বর কাটা গিয়ে সর্বোচ্চ ৭১৫ নম্বর পেতে পারে। কখনওই তার প্রাপ্ত নম্বর ৭১৯ বা ৭১৮ হতে পারে না। কিন্তু এবারে এই পরীক্ষায় তাও হয়েছে। তালিকার ৬৮ ও ৬৯ নম্বরে থাকা পরীক্ষার্থীদ্বয় তা পেয়েছে।তাই এই পরীক্ষার স্বচ্ছতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে।

এই পরীক্ষায় গত ২০২১ সালে ১৫.৪ লক্ষ পরিক্ষার্থীর মধ্যে যোগ্যতামান পেরিয়েছিল ৮.৭ লক্ষ। বোঝা যাচ্ছে যারা এই পরীক্ষায় বসেছিল তার মধ্য অর্ধেকের বেশীই চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে। আমাদের সময়ের সঙ্গে এর কোন মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তখন রাজ্য পরিচালিত জয়েন্ট এন্ট্রান্স ছিল। যারা পরীক্ষায় বসতেন তাদের মধ্য একটা ক্ষুদ্র অংশ এই ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য যোগ্যতামান পার করতে পারতেন। কিন্তু নিটের জন্য এই যোগ্যতামান পার করতে ৭২০ নম্বরের মধ্যে সাধারণ শ্রেণীর জন্য নূণ্যতম ১৬৪, এসসি বা এসটি শ্রেণী হলে তাদের ১২৯, প্রতিবন্ধী শ্রেণীর জন্য ১৪৬ নম্বর পেলেই হল। দেশে ডাক্তারি পড়ার জন্য আসনসংখ্যা ৯০৬৭৫, সরকারী মেডিক্যাল কলেজের আসন আছে মোট ৪৪৫৫৫ টি। আসনের চেয়ে বিশগুণ ছাত্রকে পাস করানোর উদ্দেশ্য পরিষ্কার। মেরিটের বাইরের ছাত্রদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ করে দেওয়া। এর মানে একটাই, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ মালিকদের জন্য বাজার তৈরী করে দেওয়া। সরকারী কলেজে পড়াশোনার খরচ নামমাত্র, কিন্তু বেসরকারী কলেজের ৪৬১২০ টি আসনের জন্য পড়াশোনার খরচ প্রতিটি আসনের জন্য ৭৫ লক্ষ থেকে ১.৫ কোটি। এর ফল কোনরকমে যোগ্যতামান পার করতে পারলে ও পকেটে পর্যাপ্ত অর্থ থাকলেই একজন পিতামাতা তার সন্তানকে ডাক্তার বানাতে সক্ষম, তা সে যত নিকৃষ্ট মানের ছাত্রই হোক না কেন।এই পরীক্ষা বার বার দেওয়া যায়। সাতবার এই পরীক্ষায় বসেছে এরকম উদাহরণ কম নেই। বর্তমান দেশে ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব ছাড়াও বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় নিয়মিত প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য অভিভাবকেরা আর্থিক নিরাপত্তা ছাড়াও সামাজিক প্রতিপত্তি এবং বিয়ের বাজারে পণের পরিমান বেশী হওয়ার কারণে ডাক্তারি পেশাটিকে লোভনীয় বলে মনে করে। তাই অনেকসময় রীতিমতো আর্থিক ঝুঁকি নিয়ে এই পরীক্ষায় তাদের সন্তানদের বসাতে চান। তার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতে পিছপা হন না।

আগে রাজ্য সরকার পরিচালিত জয়েন্ট এন্ট্রান্সের মাধ্যমে ডাক্তারি শিক্ষায় ভর্তি হওয়া যেত। কিন্তু বিজেপি সরকার শিক্ষায় কেন্দ্রীয়করণের নামে ২০১৭ সাল থেকে ন্যাশান্যাল টেস্টিং এজেন্সির মাধ্যমে নিট, নেট, জেইই, এলম্যাট, জিপ্যাটসহ বিভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং সৈনিক স্কুল ও নবযুগ স্কুলে ভর্তির পরীক্ষাও পরিচালনা করে চলেছে। তবে এই সংস্থার কার্য প্রণালী নিয়ে প্রচুর প্রশ্ন উঠে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের মদতে দূর্নীতির আখড়া এই সংস্থাটির চেয়ারম্যান আরএসএসের প্রদীপ যোশী,যার পদত্যাগ দাবী করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছেন বিজেপি ও আরএসএসের মধ্যমেধাসম্পন্ন অযোগ্য লোকেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাথায় বসানোর জন্যই শিক্ষা ব্যবস্থায় জরুরি অবস্থা তৈরী হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেছেন মোদী সরকারের আমলে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে ও শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানে নিজেদের মতাদর্শের লোক নিয়োগের ফলে গত সাত বছরে ২০ টি সরকারি চাকরি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। প্রদীপ যোশী এর আগে ইউপিএসসি,মধ্যপ্রদেশ ও ছত্রিসগড়ের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রধান ছিলেন। আরএসএসের লিখিত সুপারিশেই তার নিয়োগ হয়। যোশী আরএসএসের ছাত্র সংগঠন এভিবিপির নেতৃত্বেও ছিলেন।এনটিএ এর পরিচালনায় পরীক্ষায় অনিয়মের তদন্তের ভারও মোদী এর

ওপরে দিয়েছিলেন। রাহুল বেশ কয়েকজন নিট পরীক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে বলেন দেশের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। ছাত্রদের সরকারের সংগে লড়াই করতে হয় পড়াশোনার বদলে। আর মোদী নীরবে শো দেখেন। মধ্যপ্রদেশে ব্যাপম কেলেঙ্কারি হয়েছিল,গুজরাটে প্রশ্ন ফাঁস হয়েছিল।তিনি এও বলেছেন শিক্ষা মাফিয়াদের কাছে মোদী অসহায়। মোদীর অযোগ্য সরকার ছাত্রদের ভবিষ্যতের পক্ষে বড় হুমকি।

মধ্যপ্রদেশে মাত্র ৬ নম্বর পেয়ে আত্মহনন করে এক ছাত্র। পরে জানা যায় সে পেয়েছিল ৫৯০ যা ডাক্তারি পড়বার সুযোগ পাওয়ার সমতুল্য। ভুলে গেলে চলবে না ২০২২ সালে সারা দেশে ১৩০০০ জন ছাত্র ছাত্রী আত্মহত্যা করেছে কেন?

এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি প্রশ্ন উঠে গেছে। যেমন যে ফলপ্রকাশ হওয়ার কথা ছিল ১৪ জুন তা দশদিন আগে দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লোকসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের দিনে তা করতে হল? তাহলে কি দেশের মানুষ যখন নির্বাচনের ফল নিয়ে চর্চা করবে তার আড়ালে দুর্নীতি ঢাকা পরে যাবে এটাই এনটিএর ভাবনায় ছিল? ৬৭ জন একযোগে টপার হওয়া প্রসঙ্গে এনটিএর হাস্যকর সাফাই ছিল , পরীক্ষার্থী বেশী,সহজ প্রশ্ন (যদিও জানা গেছে বিশেষ করে পদার্থবিদ্যার প্রশ্ন যথেষ্ট কঠিন ছিল) এবং গ্রেস মার্কস। প্রশ্নপত্র দেরী করে পৌঁছানো ও এনসিআরটির পুরানো বই এর উত্তর বিবেচনা করে এই অতিরিক্ত নম্বর দেওয়া হয়েছে বলে এনটিএ জানিয়েছে। কেন অতিরিক্ত সময় দেওয়া হল না এই দেরী করে পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার ক্ষতিপূরণ হিসাবে? আর ২০১৭ সালে যে বই এর কথা তারা বলল তা তো কবেই তামাদি হয়ে গেছে। কেউ এই পরীক্ষা দিতে চাইলে ২০২৪ সালে সাত বছর আগেকার বই পড়বে? যদিও ১৫৬৩ জনকে যে গ্রেস নম্বর দেওয়া হয় তা প্রত্যাহার করা হয়েছে ও তাদের সামনে পুনরায় পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ বা বিনা গ্রেস নম্বরসহ ফল মেনে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

আসলে দুর্নীতির শুরুটা হয় রেজিস্ট্রিকরণের সময় থেকে যা শুরু হয় ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে। তা ১৬ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়। আবার হঠাৎ ৯ ও ১০ এপ্রিল এই নথিভুক্ত করার জানালা খুলে দেওয়া হল। পরীক্ষা কয়েকদিন আগে কাদের স্বার্থে বা কাদের সুবিধার জন্য এটা করা হয়েছিল?

২০২২ ও ২০২৩ সালে যথাক্রমে ৪ ও ২ জন সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিল। তা এবারে কিভাবে ৬৭ জন এই নম্বর পেল? এক কেন্দ্রে ৬ জন কিভাবে তা পেল? হরিয়ানার একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে ১৬ টি রাজ্যের পরীক্ষার্থীরা কেন হাজার কিমি দূর থেকে এসে পরীক্ষা দিতে ব্যগ্র তা নিশ্চই তদন্ত করা উচিৎ। কেন এটি একটা যোগ্যতামান পাওয়ার জন্য ডেস্টিনেশন সেন্টার হয়ে উঠেছিল?

দেশের মোট ৫৫৭ টি শহরের ও বিদেশে ১৪ টি শহরের প্রায় পৌনে পাঁচ হাজারটি কেন্দ্রে মোট প্রায় ২৪ লক্ষ পরিক্ষার্থী এই প্রবেশিকা পরিক্ষায় বসেছিল। তাহলে একটি কেন্দ্রর এত চাহিদা কেন? দেখা গেছে বিজেপি শাসিত রাজ্য যেমন মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, বিহার, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা থেকেই অভিযোগ এসেছে। ইতিমধ্যে কুড়ি জনকে ধরা হয়েছে। পুলিশের কাছে একশ কোটি টাকার হাতবদলের প্রমাণ রয়েছে। কত হাজার কোটি টাকার খেলা তা তদন্ত সাপেক্ষ। অমিত আনন্দ মুঙ্গেরে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে প্রশ্নপত্র বিক্রির দোকান খুলে বসেছিল। গুজরাটের গোধারায় অভিযোগের কেন্দ্রে থাকা জালারাম স্কুলের প্রিন্সিপ্যালসহ তিনজনের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। মহারাষ্ট্রে দুই শিক্ষকসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।এদের ফোনে এডমিট কার্ড ও আর্থিক লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে। দিল্লীর একজনের সঙ্গে এই দুর্নীতির যোগসূত্র পাওয়া গেছে। বিহারে তো চারজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে আগেই। বিহারে প্রশ্নফাঁসের মাথা সন্জীব সিংহকে পুলিশ এখনও গ্রেপ্তার করতে পারে নি। সে আর তার ছেলে মিলে চালাত মুখিয়া সলভার গ্যাং। এরা ১৭ টি প্রশ্নপত্র ফাঁসে অভিযুক্ত। এরা নাকি ৩০০ কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষমাত্রা রেখেছিল নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসে। আগাম প্রশ্ন অথবা প্রক্সি দেওয়ার কাজে এর দর রাজ্যে ভালোরকম।

এনটিএর আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ওএমআর শিট কারচুপি করার অভিযোগে সিবিআই ও ইডির তদন্তে আর্জি জানিয়ে সুপ্রীম কোর্টে মামলা করা হল। এদিকে উত্তরপ্রদেশে

নিয়োগ দুর্নীতিতে চার ইঞ্জিনিয়ারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গত সাত বছরে ৭০ টি প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে যার পরিচালনায় দায়িত্বে এনটিএ। এর ফলে ২ কোটি পরীক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্থ। ইউ টিউবে মুখ ঢাকা দিয়ে একজনকে বলতে শোনা গেছে কোথায় কিভাবে প্রশ্ন ফাঁস হবে তার বিবরণ দিতে। কয়েকটি টেলিগ্রাম গ্রুপে টাকার বিনিময়ে প্রশ্নপত্র লেনদেনের প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রশ্নপত্র পিছু ৪০ থেকে ৬০ লক্ষ টাকা রেট ছিল বলে জানা গেছে। সঠিক উত্তর লেখার জন্য সলভার গ্যাং ১০/১৫ লাখ টাকা করে নিয়েছে বলে খবরে প্রকাশ। সব মিলিয়ে এই দুর্নীতিতে অন্তত হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে হয়।

এবারের ঘটনার পর ডিজি সুবোধ কুমার সিং কে সরিয়ে দিলেও চেয়ারম্যান প্রদীপ যোশীকে সরাবার কথা এই সরকার ভাবছে না কেন তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে।বিভিন্ন দুর্নীতিকে বিজোপির নেতাদের যোগ রয়েছে তা দিন দিন স্পষ্ট হচ্ছে। আরো বড় কথা হচ্ছে গত পাঁচ বছরে পনেরটি রাজ্যে অন্তত দেড় লাখ চাকুরিপ্রার্থী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর ও ঝারখন্ড বাদে বাকি রাজ্যগুলি বিজেপি ক্ষমতায়।

কেন্দ্রের শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান প্রথম থেকে অভিযোগ অস্বীকার করলেও অবশেষে অনিয়ম ও প্রশ্ন ফাঁসের কথা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন ও তার দায়ও তিনি নিলেন দুই সপ্তাহ পর। কিন্তু দায় নিলেও পদত্যাগ করার সাহস দেখাতে পারলেন না। নিট ও নেট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নীরব কেন সেই প্রশ্নও উঠেছে। সংসদে মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার সময়ও শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বিরোধীবেঞ্চ থেকে বিদ্রুপাত্মক বিশেষণ ধেয়ে আসে। নিট পরীক্ষা বাতিল ও এনটিএকে নিষদ্ধ করার দাবীও জানায় বিরোধীরা।

এরই মধ্যে এনটিএ পরিচালিত ইউজিসি নেট পরীক্ষা বাতিল করা হল প্রশ্নফাঁসের অভিযোগে। ১৮ জুন পরীক্ষা নেওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে। ৩১৭ টি শহরে নয় লক্ষেরও বেশী পরীক্ষার্থী যারা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পড়ানোর যোগ্যতা অর্জন বা পিএইচডি করার জন্য ও স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য এই পরীক্ষায় বসেছিলেন তাদের কপাল পুড়ল। এর ফলে আজাদি কা অমৃত মহোৎসব আয়োজন করা সরকারের কোন লজ্জাবোধ দেখা গেল না। বিজ্ঞপ্তিতে কারণ না দেখিয়ে বরং অহংকারের সুরে সাফাই দেওয়া হয়েছে। তারা বলতে চাইছে সততাই মূলধন,যদি অসততা প্রমাণ হয় তা ব্যতিক্রম মাত্র। আসলে এই প্রতিবন্ধী সরকার বিনয়ের সুরটা আগেই বিলীন হয়ে গেছে। মাস্তানি ও ফ্যাসিজিম তাদের মজ্জায় ঢুকে গেছে। লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি সরকার গত ফেব্রুয়ারি মাসে এই দুর্নীতি রুখতে ঢাকঢোল পিটিয়ে সংসদে বিল পাস করিয়েছিল। শিক্ষামন্ত্রী তা ফলাও করে বিবৃতিও দিয়েছিলেন যে আইনের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়ে গেছে। কিন্তু নিজে মন্ত্রী হয়ে যে মিথ্যা বলেছিলেন তা প্রকাশ হল যখন সেই বিজ্ঞপ্তি জারি হল ২১ জুন রাতে।যার ফলে সদ্য ঘটে যাওয়া দুর্নীতিতে এই আইন কোনভাবে প্রভাব ফেলবে না। এ যেন চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ের অবস্থা।

এরই মধ্যে ডাক্তারিতে স্নাতকোত্তর ভর্তির পরীক্ষা নিট -পিজি স্থগিত রাখার সিদ্ধাম্ত নিয়েছে সরকার যা ২৩ জুন হওয়ার কথা ছিল। প্রতিদিনই পরীক্ষা বাতিলের খবর শোনার জন্য আমরা তৈরী হচ্ছি। মন্ত্রীদের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচনে জেতার জন্য। যার ফলে তারা মোদী ভজনা করে মন্ত্রীত্বের কাজে মনোযোগ দেওয়ার সময়ও পায় না। ধর্মেন্দ্র প্রধানের গত কয়েক বছর ট্যুইটগুলোতে মোদী মোদী আর মোদী,নেই কোন শিক্ষা সংক্রান্ত পোস্ট। পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর কোন চিন্তা নেই,চিন্তা ভোটে জিতে ক্ষমতায় বসে দুর্নীতির পাহাড় নির্মাণ। আরেকটা লক্ষ ধর্মীয় মেরুকরণ ও স্বাধীনতা সংগ্রামসহ পুরানো ইতিহাস ভুলিয়ে তা মিথ্যা দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া। ইউজিসি নেটে এবারে প্রশ্ন এসেছিল, রামচরিত মানসের কোন পর্বে হনুমান আবির্ভুত হয়েছিলেন? অথবা কুরুক্ষেত্রে কোন যোদ্ধার মাথা কাটা হয়েছিল, কিন্তু যুদ্ধ দেখার জন্য শেষ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন! এই পরীক্ষায় পাস করলে একজন গবেষণা করার সুযোগ পায়। যেখানে যুক্তিভিত্তিক ও বিজ্ঞানের শিক্ষা ও জ্ঞানের পরীক্ষা করা হয় সেখানে এইসব ফালতু প্রশ্নের উদাহরণ ঠিক করে দিচ্ছে আমাদের দেশ কেবল পশ্চাৎপসরনের জন্য তৈরী হচ্ছে।তবে অনিয়মের আশঙ্কায় একটা প্রবেশিকা পরীক্ষা বাতিল হল,একাধিক পরীক্ষা স্থগিত হল কিন্তু প্রশ্ন ফাঁস তো বটেই আরো হাজরো অনিয়ম যেমন প্রক্সি দেওয়া,এক একটা পরীক্ষাকেন্দ্র বিক্রি হয়ে যাওয়া, কোটি কোটি টাকা লেনদেনের এই দুর্নীতিযুক্ত নিট কেন বাতিল হল না তার জবাব সরকারের কাছে নেই কেন? তাহলে কি নির্বাচনী বন্ড এর মত সিংহভাগ টাকা বিজেপি নেতাদের পকেটে গেছে?

পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থার বিপর্যয় কেনো

শুভ বসু

(আমার বন্ধু শ্রী গৌতম রায় বামপন্থার নির্বাচনী সম্ভাবনা নিয়ে লিখছেন আর আমার অন্য বন্ধু গৌতম ঘোষ বামপন্থার ভবিষ্যৎ রূপায়ণের প্রয়াস করছেন, তাদেরকে আমার এই লেখা উৎসর্গ করা।)

পশ্চিমবাংলার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। অনেকের প্রত্যাশা ছিল বিজেপির কেন্দ্রে এবং তৃণমূলের রাজ্যে কুশাসনের ফলে বামপন্থীদের নির্বাচনী রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক হবার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু বামপন্থীদের সেই আশা দূরাশাতে পরিণত হয়েছে। যদিও বামফ্রন্টের মধ্যে তরুণ কর্মীদের উপস্থিতি নজরে পড়েছে এবং তরুণ প্রার্থীদের উৎসাহ দেখা গিয়েছে কিন্তু তবুও তাদের ভোটের পরিমাণ আশাব্যঞ্জক নয়।

প্রথমত বলা উচিত যে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচক-মন্ডলী হলেন রক্ষণশীল নির্বাচক মন্ডলী। তাঁরা ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৭ কংগ্রেস কে ভোট দিয়েছেন। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ বামপন্থীরা জিতলেও ১৯৭২ সালে নির্বাচনে বাংলাদেশের অভ্যুদয় উপলক্ষে শ্রীমতি গান্ধী কে নিয়ে একটি জাতীয়তাবাদী আবেগের সৃষ্টি হয়। তার ফলে কংগ্রেসের পক্ষে একটি জনজোয়ার ছিল। দ্বিতীয়ত সেই সময় যুক্ত ফ্রন্টের শরিকি সংঘর্ষ, নকশাল আন্দোলন এবং কিছু নকশালপন্থীর কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তনের ফলে রাজ্যে হিংসার বাতাবরণ সৃষ্টি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল। মানুষ তার থেকে নিষ্কৃতি চাইছিলেন। সেই সঙ্গে কংগ্রেসের স্থানীয় স্তরে গুন্ডাবাহিনী এবং পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর পারস্পরিক সহযোগিতার ফলে ভোটে অনেক জায়গায় কারচুপি করা সম্ভব হয়েছিল। বামদের নিজেদের মধ্যে ঐক্য ছিল না। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেস কে প্রগতিশীল শক্তি ভাবতেন। আবার ফরওয়ার্ড ব্লক, আর এস পি এবং (UCI , সিপিআই (এম) এর বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েছিলেন। ফলে বামপন্থিদের পরাজয় হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৭ সালে বামপন্থীরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে নির্বাচন লড়লে তাঁরা আবার ক্ষমতায় ফেরত আসেন এবং ২০০৬ সাল পর্যন্ত তাঁরা নির্বাচনে জেতেন। আবার ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে ও এখন পর্যন্ত তাঁরা কোনো নির্বাচনে হারেন নি। মানে পশ্চিমবাংলার নির্বাচক মন্ডলী ধারাবাহিকতা পছন্দ করেন। ১৯৮৪ সালে শ্রীমতি গান্ধীর মৃত্যুর পরে ভাবাবেগের ফলে বামফ্রন্টের এবং ২০১৯ সালে পুলওয়ামা নিয়ে জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগের ফলে তৃণমূলীদের অনেক আসনে পরাজয় হলেও ধারাবাহিকতায় কোনো ছেদ পরে নি।

তৃতীয়ত পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের ফল পরিবর্তন হয় গণ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। কংগ্রেস ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলন , ১৯২০-২২ খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন , ১৯২৮ এ সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলন , ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ লবন সত্যাগ্রহ এবং ১৯৪২ এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন করে পশ্চিম বাংলার মানুষের মনে একটা স্থান করে নিয়েছিল। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের অন্যতম নায়ক সতীশ সামন্ত ও অজয় মুখার্জি ১৯৬৭ সালে কংগ্রেস ছাড়লে কংগ্রেসের ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে যায়। বামেরাও ১৯৪০ সাল থেকে তেভাগা আন্দোলন, ১৯৪৫ এ আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন, ১৯৫২র পরে ট্রামভাড়া বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন , উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে আন্দোলন এবং তার পরে ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন করে তাঁদের ভাবমুর্তি উজ্জ্বল করেন। এই আন্দোলনের ফলে সাংস্কৃতিক জগতেও রূপান্তর হয়। কংগ্রেসের আন্দোলনের সময় জাতীয়তাবাদী গান নাটক পালা গান আর ১৯৪৫ -১৯৪৬ থেকে IPTA র সাংস্কৃতিক জগতে আন্দোলন, গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন, IPTA র বাইরে উৎপল দত্তর একাধিক সারা জাগানো নাট্য নির্মাণ, ঋত্বিক - মৃনাল সেনের ছায়াছবি নির্মাণও মানুষের মধ্যে হেজেমনি বা আধিপত্যের পরিবর্তন করে। সেই সঙ্গে ছিল বিশ্ব রাজনীতির সঙ্গে আদান প্রদান। বিংশ শতকের গোড়ায় ছিল ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময়। কংগ্রেস সেই সময় গুরুত্ব পায়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত ছিল বিশ্ব জুড়ে সামাজিক ন্যায়ের এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বিজয়ের সময়। চীনের বিপ্লব, আলজেরিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধ, কিউবার বিপ্লব, আফ্রিকারদেশ গুলির স্বাধীনতা লাভ, ট্রাই কন্টিনেন্টাল মুভমেন্ট, ভিয়েতনাম যুদ্ধর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আন্দোলন এবং ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ প্যারিস থেকে মেক্সিকো সিটি, পাকিস্তানের বিরূদ্ধে ঢাকার গণ অভ্যুত্থান, চিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব, চে এবং ক্যাস্ট্রোর যুব বিপ্লবের প্রতীকে রূপান্তরতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে যুক্ত যুক্তফ্রন্টের বিজয়। আলজেরিয়ার

স্বাধীনতা যুদ্ধ হল ফানোর তত্ত্বায়নের পরিপ্রেক্ষিত। ৬০ এর দশকের ইউরোপএ আলথুসের, মারকুসে পোলানজেস, রাল্ফ মিলিব্যান্ড, রেমন্ড উইলিয়ামস, E P Thomson, Perry Anderson এবং হাবেরমাসের উত্থ্যান। ১৯৬৬ র চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ছায়াতেই নকশাল আন্দোলনের সূচনা। লিন বিয়াওর ভারতে বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ নকশালদের অনুপ্রেরণার ভিত্তি। আবার ১৯৮০ র দশক থেকে সারা বিশ্ব জুড়ে একদিকে বিশ্বায়নের এবং উদারীকরণের ধাক্কা আবার অন্যদিকে ইরানের ইসলামিক বিপ্লবের পর থেকে ধীরে ধীরে সারা বিশ্ব জুড়ে ধর্মীয় বা বর্ণভিত্তিক চরমপন্থী আন্দোলনের উত্থান। ভারতে খালিস্তানি উগ্রপন্থার প্রবল শক্তি বৃদ্ধি , ফলত স্বর্ণ মন্দিরের উপর আক্রমণ এবং ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের পর শিখ বিরোধী দাঙ্গা হল ১৯৯২ এর বাবরি মসজিদ ভাঙার পূর্বসূরি এবং ২০০২ সালে গুজরাটের দাঙ্গার পূর্বাভাস। সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদের জনক হলো উদারনৈতিক বাজার অর্থনীতির মৌলবাদ।

কাজেই বামপন্থীদের দেশের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন স্মরণ রাখতে হবে। ল্যাটিন আমেরিকার পিঙ্ক টাইড বাদ দিলে সারা পৃথিবীতে এখন ট্রাম্প, নাইজেল ফ্যারাজ এবং ইতালির ফ্যাসিস্ট বা তালেবান ইসলামিক স্টেট্ এবং বজরংদলের দাপট। বামপন্থার জয় লাভ করতে গেলে মূল দ্বন্দ্ব গুলিকে চিহ্নিত করে সেই দ্বন্দ্বের ভিত্তিতে গণ আন্দোলন করলে তবে ব্রাজিলের ওয়ার্কার্স পার্টি র মতো জয় সম্ভব।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের দুটি চরিত্র। এক দিকে তৃণমূল হলো কংগোর বা সেকালের জাইরের মোবতু শেষে সিকোর মত দুর্নীতি, প্রতারণা ও ধাপ্পাবাজ দের দল। তারা একসঙ্গে জরুরি অবস্থার স্বৈরতন্ত্রী রাজনীতির উত্তরাধিকারী আবার অন্যদিকে তৃণমূল হলো কল্যানমুলক রাজনীতির প্রতীক। লক্ষীর ভান্ডার , সবুজ সাথী, কন্যাশ্রী প্রমুখ করে তৃণমূল মহিলাদের মধ্যে এক বিশাল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। আবার তৃণমূল পশ্চিমবাংলার যে বিশাল মুসলিম জনগণ রয়েছেন যাঁদের হিন্দু সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদের প্রতি প্রবল ভীতি ও বীতরাগ রয়েছে তাঁদের আশ্রয়দাতা। এই দুই নির্বাচনী কনষ্টিটুয়েন্সি মিলিয়ে তৃণমূল কিন্তু এই রাজনৈতিক মেরুকরণের ফসল তুলে নিয়ে যাচ্ছেন। বামপন্থীদের ভাবতে হবে মহিলা, সংখ্যা লঘু,আদিবাসী দলিতদের কাছে কি ভাবে অধিকার বোধের রাজনীতি পরিচিত করাতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে রাজবংশীদের বিরাট অংশ বিজেপির সমর্থক। দক্ষিণে মতুয়াদের একটি বড় অংশ বিজেপির সমর্থক আবার মালদহ জেলায় সাঁওতালদের একটি বড় অংশ বিজেপির সর্মথক। অর্থাৎ বাম পন্থীদের যারা মূল সমর্থক গোষ্ঠী হতে পারেন যেমন মহিলা দলিত আদিবাসী তাঁদের অনেকেই তৃণমূল এবং বিজেপির সমর্থক।

বামপন্থার ভবিষ্যৎ তাই তাঁদের নিজস্ব পথ কিভাবে বাছতে পারেন তার উপরে নির্ভর করবে। এখন হলো সামাজিক মাধ্যমের, দূরদর্শনের এবং সংবাদ মাধ্যমের যুগ। কোনো কথা গোপন থাকে না। আবার সংবাদ মাধ্যমের পুঁজিবাদী মালিকরা তাদের মতো করে খবর ছাপান। অনেকটা ইস বার চারশপারের নির্বাচন সমীক্ষার ফলের মতো কিন্তু জনগণ সজাগ। তাঁরা যা বোঝার বুঝে নেন। অতএব বামপথের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে কি ভাবে গণ আন্দোলন গড়ে তোলা যায় তার উপরে।

লেখক টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক।

দেশে পরাজিত মোদি, বঙ্গে বামপন্থীরাও

(শেষাংশ)

নন্দন রায়

‘নাগরিক’-এর ১৭ জুন সংখ্যায় উপরিউক্ত শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, যাতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেয়েও এনডিএর প্রধানমন্ত্রী হয়ে মোদি আবার পুরনো খেল দেখাতে শুরু করেছেন তার একটা অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের নির্ধারক পরাজয় সম্পর্কে কিছু লেখার সুযোগ হয়নি। এখন সেই কথা বলার চেষ্টা করব।

প্রথমেই যে বিষয়টা পাঠকরা লক্ষ্য করেছেন তা হ’ল এই যে ২০১৬ সালের ৮ বছর পরে এই প্রথমবার মানুষজনের মনে হচ্ছিল যে বামপন্থীরা এবার বোধহয় ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। (২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে প্রথমবার বামপন্থীরা কংগ্রেসের সাথে জোট বেঁধে তৃণমূলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে কিছুটা আশা জাগিয়েছিল বটে, কিন্তু সেটা এবারের মত সংবাদ মাধ্যমের বিশ্লেষণের কারণ হয়ে ওঠেনি।) বাম-কংগ্রেস কাছাকাছি

হ'লেই কর্পোরেট মিডিয়া এবং ধান্ধা পুঁজির মাথাব্যাথার কারণ হয়ে ওঠে। ২০১১ সালেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল যে বামপন্থীদের এই রাজ্যের রাজনীতি থেকে উৎখাত করতে হবে। ভারতের দীর্ঘস্থায়ী গণতান্ত্রিক বিপ্লবে মতাদর্শগত দিক দিয়ে বামপন্থীরা ও জাতীয় কংগ্রেস স্বাভাবিক এবং সাধারণ মিত্র, যা একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করে, তাই রাজনীতিগতভাবে তৃণমূল অথবা বিজেপির মতাদর্শ অথবা মতাদর্শহীনতার ঠিক বিপরীত দিকে বাম-কংগ্রেসের অবস্থান। অথচ কর্পোরেট মিডিয়া এই সাধারণ সত্যটাকে গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টার ত্রুটি করলো না এবং বাম ও কংগ্রেসের নেতাদের বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে সঠিক ভাবে বুঝতে না পারার কারণে, তাঁরা এর বিরুদ্ধে কোন অর্থবহ পালটা প্রচার গড়ে তুলতে পারলেন না।

পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের সাথে কংগ্রেসের যাতে আসন সমঝোতা না হয় তার জন্য মমতা বন্দোপাধ্যায় দিল্লীতে কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের সাথে অনেক দৌত্য করেছিলেন, কিন্তু রাজ্য কংগ্রেসের গোটা নেতৃত্বই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে বেঁকে বসলেন এবং সমঝোতা রোখা গেল না। এর ফলে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা দেখা দিল বটে, কিন্তু নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেল যে পশ্চিমবঙ্গে কার্যত দ্বিমুখী প্রতিদন্দ্বিতাই হয়েছে। এর কারণ যতটা না তৃণমূল- বিজেপির সুচারু নির্বাচনী কৌশলের সফল প্রয়োগ দায়ী, তার থেকেও বেশি দায়ী বামপন্থীদের অন্ধ তৃণমূল- বিরোধিতা। অথচ সারা দেশের ক্ষেত্রে যখন বিজেপিকে পয়লা নম্বর বিপদ ব'লে ইন্ডিয়া ব্লক চিহ্নিত করেছে, এই রাজ্যে তার ব্যত্যয় ঘটবে কেন? যেহেতু এই রাজ্যে বাম-কংগ্রেস কর্মীরা তৃণমূলের হাতেই বেশি মার খেয়েছে, তাই কি উভয় দলের রাজ্য নেতৃত্ব দলের কর্মীদের দীর্ঘস্থায়ী কষ্টকর রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়ার বদলে একতরফা তৃণমূল-বিরোধিতার সোজা পথটিই বেছে নিয়েছেন? তৃণমূলের বিরোধিতা অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু তাই ব'লে তৃনমূলের অসীম কুকীর্তির সমালোচনা এমন ভাবে করা উচিত ছিল তা যেন বিজেপির অশিক্ষিত তৃণমূল বিরোধিতার সাথে সমে বাঁধা না পড়ে, যেন সেই সমালোচনায় একটা 'বামপন্থী' ছাপ থাকে,। হাইকোর্ট যখন প্রকাশ্যেই বিজেপির অনুগত রায় দিচ্ছে (যেমন অযোগ্য প্রার্থী বাছাই করার কষ্টকর অনুশীলনে না গিয়ে কলমের এক খোঁচায় ২৬ ০০০ শিক্ষকের চাকরি খেয়ে নেওয়া অথবা মুসলিম ওবিসিদের তালিকা ছাঁটাই করা), তখন নির্বাচনী ফলাফল যাই হোক না কেন, বামপন্থীদের জনস্বার্থেই তার বিরোধিতা করা উচিত ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে অত্যন্ত অন্যায় ভাবে দুর্নীতির ধুয়া তুলে ১০০ দিনের কাজ এবং আবাস যোজনার প্রাপ্য টাকা থেকে রাজ্যকে বঞ্চিত করা যে দেশের ফেডারেল ব্যবস্থার বিরোধী, এই স্লোগানে জনসমাবেশ করা বামপন্থীদের একান্তই উচিৎ ছিল। তার বদলে তারা তূষ্ণীভাব অবলম্বন করলেন। এটা বাম-কংগ্রেস অথবা তৃণমূলের বিষয় নয়, ফ্যাসিস্ট মোদির প্রতিহিংসা।

এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার ক'রে কখনো মমতা বন্দোপাধ্যায় বললেন ইন্ডিয়া ব্লকের অস্তিত্ব এই রাজ্যে নেই কারণ বামপন্থীরা ও কংগ্রেস এখানে তৃণমূলকে হারানোর জন্য বিজেপির সঙ্গে জোট বেঁধেছে। পালটা মোদি-অমিত শাহরা বললেন এখানে তৃণমূলের সঙ্গে বাম-কংগ্রেস জোট বেঁধে বিজেপিকে হারাতে চাইছে। উলটোদিকে বাম কংগ্রেসের প্রচারের লক্ষ্যবস্তু যতটা তৃণমূলের বিরুদ্ধে ছিল, ততটা বিজেপির বিরুদ্ধে নয়। অথচ এই দুই দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব স্বাভাবিক ভাবেই বিজেপিকেই দেশের প্রধান শত্রু হিশেবে চিহ্নিত করেছিলেন। বামপন্থী ও কংগ্রেসকে এ রাজ্যের রাজনৈতিক পরিমন্ডল থেকে হঠিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে বিজেপি ও তৃণমূল যে একমত সে বিষয়ে কোন দ্বিধার অবকাশ নেই। যদি কোন 'সেটিং' এই দুই দলের মধ্যে হয়ে থাকে, তাহ'লে এই দুই দলের মতের মিলের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যেমন বাম ও কংগ্রেসের মধ্যে মতাদর্শগত মতের মিল রয়েছে। তাকে যেমন 'সেটিং' বলা যায় না, বিজেপি-তৃণমূলের মধ্যেও কোন গোপন 'সেটিং' নেই। অথচ বামপন্থীরা কেবল 'সেটিং' তত্ত্ব তুলে তৃণমূলকে আক্রমণ করেছেন , বিজেপি বিরোধিতা অবহেলিত থেকেছে।

ফলে মমতা বন্দোপাধ্যায় যখন চিৎকার করে 'আমি বেঁচে থাকতে এ রাজ্যে সিএএ হ'তে দেব না' বলে চিৎকার করেন, বামপন্থীদের এই বিষয়ে গলার স্বর প্রায় শোনাই যায় না, যেন মমতা যা বলবেন তার বিরোধিতা করা তাদের কর্তব্য। (অথচ নির্বাচনের ঠিক আগে গুটি কয়েক

সিএএ-নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে যাতে মতুয়া ভোট বিজেপির হাতছাড়া না হয়।। কর্পোরেট মিডিয়া খবরটা যথাসম্ভব নরম করে লিখেছে।)

আরও উদাহরণ দেওয়া যায়। বামপন্থীরা কতবার কেন্দ্রীয় সরকারের খামখেয়ালে ১০০ দিনের কাজ ও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আটকে রাখার বিরুদ্ধে মিছিল মিটিং করেছেন? অথচ মমতা প্রতি মিটিং-এ বিজেপির বাংলা বিরোধিতার প্রমাণ হিশেবে এসব ঘটনা পেশ করেছেন। এরকম জলজ্যান্ত প্রমাণ পেশের পরে তিনি যখন বলেন তার আশংকা বিজেপি এবার জিতলে লক্ষ্মীর ভান্ডারেও হাত দেবে, গরীব মানুষ সেকথা বিশ্বাস করেছেন আর বামপন্থীরা 'হিরন্ময় নীরবতা' পালন করেছেন। এইভাবে বাম-কংগ্রেস সমঝোতাকে আরও পাকা খেলোয়ার মোদি ও মমতা নির্বাচনী ময়দানে জনমত নিজেদের পক্ষে টেনে আনার লড়াই-এ ঘোল খাইয়ে ছেড়েছেন।

বিজেপি জানতো যে এই রাজ্যে দুর্বল সংগঠন ও নেতৃত্বের দুরদর্শিতার অভাবে গরিষ্ঠ সংখ্যক আসন হাসিল করা সম্ভব নয়। অতএব, নির্বাচনি প্রচারের কৌশলটি এমন করতে হবে যাতে বাম-কংগ্রেসের বদলে তৃণমূল সুবিধে পায়। এইরূপ কৌশলের কয়েকটি ওপরে আমরা উদাহরণ হিশেবে দিয়েছি। অথচ বামপন্থী ও কংগ্রেসের সমঝোতা কোনকালেই এত মসৃণ ছিলনা। উভয় দলের কর্মীদের মধ্যে নতুন জোয়ার দেখা দিয়েছিল এবং সভা-সমিতিতে মানুষের ভীড় চোখে পরার মত।কিন্তু বামপন্থীদের মাথা থেকে যতদিন সরকার গড়ার ভুত না নামবে, ততদিন বুর্জোয়া ব্যবস্থায় ভোট 'করানোর' মূল কৌশলটি আয়ত্ত করতে পারবেন না। তদুপরি গোটা দুনিয়ায় তথা দেশে এখন নয়া উদারবাদী প্রতিক্রিয়ার ঢেউ চলছে। এমতাবস্থায় বামপন্থীদের ভিন্নতর কৌশল অবলম্বন করতে হবে যার পথ বাতলে দেবেন আরাম কেদারায় বসা বিপ্লবী তাত্ত্বিকরা নন, মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত কর্মীরাই সেই দিশা দেখাতে পারেন।

(পাঠক লক্ষ্য করেছেন নিবন্ধের এই অংশে আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর স্বপক্ষে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কোন পরিসংখ্যান ব্যবহার করিনি। তাতে নিবন্ধটির কলেবর কেবল বৃদ্ধি পেত।)

ওয়ার্ক পারমিট বাতিল ঃ দ্বিতীয় ফরাসি সাংবাদিক এই দেশ ছাড়লেন

শুভাশিস মজুমদার

ফরাসি সাংবাদিক সেবাস্তিয়ান ফার্সিস, যিনি গত ১৩ বছর ধরে ভারতে দক্ষিণ এশিয়ার সংবাদদাতা হিসাবে কাজ করেছেন, ২০ জুন, বৃহস্পতিবার, দাবি করেছেন যে তিনি ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ বাড়ানোর অস্বীকৃতির পরে এই দেশ ছাড়তে বাধ্য হন।

ফার্সিস হলেন দ্বিতীয় ফরাসি সাংবাদিক যাঁকে গত চার মাসে ভারত ওয়ার্ক পারমিট প্রত্যাখ্যান করেছে বলে অভিযোগ। এক্স-এ পোস্ট করা একটি বিবৃতিতে, ফার্সিস এটিকে 'বোধগম্যহীন সেন্সরশিপ' বলে অভিহিত করেছেন। '১৭ই জুন, আমাকে ভারত ছাড়তে বাধ্য করা হয়। (ভারত) এমন একটি দেশ যেখানে আমি সাংবাদিক হিসেবে থাকতাম এবং ১৩ বছর ধরে কাজ করেছিলাম, রেডিও ফ্রান্স ইন্টারন্যাশনাল, রেডিও ফ্রান্স, লিবারেশন এবং সুইস ও বেলজিয়ামের পাবলিক রেডিওর দক্ষিণ এশিয়া সংবাদদাতা হিসেবে।' বিবৃতিতে ফার্সিস বলেছেন।

তাঁর মতে, মন্ত্রক ৭ মার্চ তাঁর সাংবাদিক অনুমতি পুনর্নবীকরণ করতে অস্বীকার করে এবং লোকসভা নির্বাচন কভার করার অনুমতি প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে তাঁকে অবহিত করে। তিনি বলেন, মন্ত্রণালয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে ও বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও কাজের নিষেধাজ্ঞার কোনো ন্যায্য কারণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে উল্লেখ করা হয়নি।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ফার্সিসের অভিযোগের বিষয়ে মন্তব্য পাওয়া যায়নি। মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স এর মুখপাত্র রন্ধির জয়সওয়াল জানিয়েছেন যে তিনি যত দূর জানেন, ফার্সিসের পুনর্নবীকরণের আবেদন বিবেচনাধীন আছে। সংবাদে প্রকাশ, মার্চ মাসে নিষেধাজ্ঞা জারীর সাত মাস আগে থেকে তাঁর আবেদন অমীমাংসিত পড়েছিল।

ফার্সিস বলেন,'এই কাজের নিষেধাজ্ঞাটি একটি বড় ধাক্কা হিসাবে আমার কাছে আসে। এটি ভারতের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে আমাকে জানানো হয়েছিল। (ভারতের সাধারণ নির্বাচন) বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক নির্বাচন, যা আমাকে কভার করতে নিষেধ করা হয়েছিল। এটি আমার কাছে বোধগম্যহীন সেন্সরশিপ।'

ফার্সিস আরো বলেন,তএই অস্বীকৃতি, বিদেশী সাংবাদিকদের কাজের উপর ক্রমবর্ধমান বিধিনিষেধের উদ্বেগজনক প্রেক্ষাপটের মধ্যেই এসেছে। ভ্যানেসা ডগনাকের পরে, চার মাসের মধ্যে আমি দ্বিতীয় ফরাসি সাংবাদিক যাকে এই পরিস্থিতিতে ভারত ছাড়তে হচ্ছে। অন্তত পাঁচজন ওভারসিজ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া (ও সি আই) বিদেশী সংবাদদাতাকে বিগত দুই বছরেরও কম সময়ে সাংবাদিক হিসেবে কাজ করা থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ফার্সিস এখন ফ্রান্সে একটি নতুন ওয়ার্ক পারমিটের জন্য তাঁর করা আবেদনের বিষয়ে ভারত সরকারের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি একজন ওভারসিজ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া (ও সি আই) কার্ডধারী এবং একজন ভারতীয়কে বিয়ে করেছেন। ফেব্রুয়ারিতে, ফরাসি সাংবাদিক ডগনাক, যিনি একজন ভারতীয়কে বিয়ে করেছেন এবং গত ২২ বছর ধরে ভারতে বসবাস করেছেন, তিনি তাঁর ও সি আই কার্ড বাতিলের বিষয়ে ভারত সরকারের কাছ থেকে একটি নোটিশ পাওয়ার পরে এই দেশ ছেড়ে চলে যান।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রক, তাঁর বিরুদ্ধে 'দূষিত প্রতিবেদনের' মাধ্যমে 'ভারত সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা'ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ করেছে বলে সংবাদে প্রকাশিত।

রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস এর এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে যে ২০১৪ সাল থেকে নিহত ২৮ সাংবাদিকের মধ্যে কমপক্ষে ১৩ জন পরিবেশ-সম্পর্কিত (অবৈধ ও অনুচিত কাজকর্ম) বিষয়গুলি নিয়ে সাংবাদিকতার কাজ করছিলেন - প্রধানত জমি দখল এবং শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে অবৈধ খনন। ভারতের তথাকথিত বালি মাফিয়া, একটি সংগঠিত অপরাধ নেটওয়ার্ক যা দেশের বিকাশমান নির্মাণ শিল্পের জন্য অবৈধভাবে বালি খনন করে। সেই বিষয়ে আগ্রহ নেওয়ার জন্য বেশ কয়েকজন সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে। অভিযোগ, এই মাফিয়ারা রাজনীতিবিদদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং প্রায়শই তাদের দ্বারা সুরক্ষিত। মাফিয়ারা সাংবাদিকদের চিরতরে চুপ করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই ধরনের হত্যা সংগঠিত করে।

ওই প্রতিবেদনেই আরো জানানো হয়েছে, নিহত অন্য ১৫ জন সাংবাদিক দুর্নীতি, সংগঠিত অপরাধ, নির্বাচন এবং মাওবাদী কার্যকলাপ বিষয়ে সংবাদ প্রকাশ করার কাজে যুক্ত থাকায় দুষ্কৃতিদের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছিলেন। নিহত ২৮ জনের মধ্যে একজন মহিলা ছিলেন। তিনি গৌরী লঙ্কেশ, যিনি প্রচারিত মিথ্যা তথ্যের বিরুদ্ধে সত্যান্বেষীর কাজ করছিলেন। ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে বেঙ্গালুরুতে তাঁর বাড়ির বাইরেই তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়। অভিযোগের তীর দক্ষিণপন্থী উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের সদস্যদের দিকে। এর আগে উগ্র দক্ষিণপন্থী সংগঠনের সদস্যরা অনলাইনে তাঁকে চূড়ান্ত হয়রানি করে।

এছাড়া সাংবাদিকদের উপরে ইউ এ পি এ আইনের ধারা প্রয়োগ এবং জেলবন্দী করে রাখার ঘটনাও রয়েছে।

করোনা কালে (২০২০ সালে) যে সমস্ত চিত্র সাংবাদিক ভারতের মানুষের (বিশেষত প্রবাসী শ্রমিকদের) কঠিন দুর্দশার বিভিন্ন ছবি প্রকাশ করছিলেন, মোদী সরকারের সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতা তাঁদেরকে শকুনের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তিনি অভিযোগ করেন, ইচ্ছাকৃতভাবে ভারতের ভাবমূর্তি বিশ্বের দরবারে কালিমালিপ্ত করার উদ্দেশ্যে এই ছবিগুলি প্রকাশ করা হচ্ছে। চিত্র সাংবাদিকদের সংগঠন যার তীব্র প্রতিবাদ করে।

উল্লেখ করা যায়,রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্সের ২০২৪ সংস্করণে বিবেচনা করা ১৮০টি দেশের মধ্যে ভারত ১৫৯তম স্থানে রয়েছে। সাম্প্রতিক অতীতে ভারতের অবস্থার উল্লেখযোগ্য অবনমন ঘটেছে।

কুকিরা মনিপুরের সঙ্গে থাকতে চায় না

মনিরুল হক

মণিপুরের সঙ্গে থাকলে আমাদের জীবন ও সম্পত্তির কোন অধিকার থাকবে না। থাকবে না শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবিক ব্যবহার পাওয়ার অধিকারও। মানসিক ভাবেও আমরা বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করছি। তাই আমরা চাইছি সংবিধানের ২৩৯-এ ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে স্বায়ত্বশাসন। শুধু শ্লোগান মুখরিত রাজপথ নয়, এই দাবি কেন্দ্রীয় সরকারের দরবারেও পৌঁছে গেল কুকি-জো সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে পেশ করা এক যৌথ দাবিপত্রের মাধ্যমে।

গত ২৪ জুন যেদিন নতুন লোকসভার প্রথম দিনের অনুষ্ঠান শুরু হল সেদিনই মণিপুরের কুকি-জো অধ্যুষিত

জেলাগুলিতে (চুড়াচাঁদপুর, চান্দেল, তেনগৌপল, কাংপোকপি, ফেরজাওল প্রভৃতি) হাজার হাজার মানুষের সুসংগঠিত ও শান্তিপূর্ণ মিছিল থেকে আওয়াজ উঠল - 'অধীনতা ও নিপীড়নমুক্ত জীবন চাই'

কেন্দ্রে ও রাজ্যে বিজেপি পরিচালিত সরকারের পরিকল্পিত বিভেদমূলক নীতি ও কার্যসূচীর কারণে অনেকদিন ধরেই মণিপুরে মেইতে ও কুকি জনগোষ্ঠীর মধ্যে অবিশ্বাস ও বিরোধের বাতাবরণ তৈরি হচ্ছিল। গত বছরের ৩ মে তা বিস্ফোরনের আকার ধারণ করে। সুযোগ বুঝে সরকার সেই বিরোধকে অরও উস্কে দেয়। পরিণতিতে আমরা দেখি এক ভয়াবহ দাঙ্গা। সে সময় বিজেপি দলের কুকি এম এল এ রা একযোগে দাবি করেছিলেন রাজ্য সরকারের অধীনেই পাহাড়ের স্বায়ত্বশাসন। এখন তাঁদের সে দাবি আর পাত্তা পাচ্ছে না। কুকি জনগোষ্ঠী তাঁদের অবস্থান আরও কঠোর করেছেন। তাঁরা এখন মণিপুরের সঙ্গে কোন সংস্রব রাখতে চান না। তাঁরা চান পাহাড়ি এলাকাটা হবে আইনসভা সহ একটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল। ভারতীয় সংবিধানের ২৩৯ এ ধারা অনুযায়ী এরকমটি হতেই পারে।

কুকি-জো জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সংগঠনের যৌথ মঞ্চ 'অল ইন্ডিজেনাস ট্রাইবাল লিডারস্ ফোরাম (ITLF) এবং 'কমিটি অন্ ট্রাইবাল ইউনিটি (COTU) এদিন আলাদা আলাদা ভাবে সভা ডাকলেও দবি ছিল একই। তাঁদের উভয়েরই দাবি তাঁরা শান্তি চান, তাঁরা চান সামরিক প্রভাবমুক্ত হতে, তাঁরা চান রাজনৈতিক সমাধান। তাঁরা মনে করেন একত্রিত হলেও তাঁরা মেইতের ঘৃণা থেকে মুক্ত হবেন না। যেহেতু প্রশাসনের সব জায়গায় মেইতেদের আধিপত্য, প্রায় সবকিছুই মেইতেদের মত অনুযায়ী ঘটবে তাই তাঁরা পদে পদে অত্যাচারিত হবেন, বঞ্চিত হবেন।

এবারের নির্বাচনের মেইতে অধ্যুষিত ইনার মনিপুর কেন্দ্র থেকে বিজয়ী হয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থী আঙ্গোমচা বিমল আকোইজাম। প্রচার পর্বে তাঁর যে কথাটি সব মানুষের মনে ধরেছিল তা হল 'মণিপুরের সম্মান'। তিনি বলেছিলেন মণিপুরে শান্তি ফিরিয়ে, সৌহার্দ্য গড়ে মণিপুরের মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে হবে। অপদার্থ অযোগ্য বিজেপির উপর মানুষের ভরসা নেই। লোকসভার ভোটে মানুষ তাদের পরাজিত করেছে। কিন্তু তবুও শান্তি, সৌহার্দ্য ও সংস্কৃতির মণিপুরকে ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত কঠিন কাজ।

নাগাল্যান্ডের সাম্প্রতিক অবস্থা

এক নাগা সাংবাদিকের প্রতিবেদন

নাগারা চিরকালই তাদের উপজাতীয় সাম্যবাদ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ মানসিকতার জন্য প্রশংসিত হয়েছে। তারা খোলা মনের এবং আমোদপ্রেমী মানুষ হিসাবে বিবেচিত হত। ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সকল কর্মকান্ডে সাম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত রেখেছে সবসময়। কোনও কিছুই স্থির থাকে না। সবই বদলে যায়। আজ আমরা কোথায় আছি এবং ভবিষ্যতের জন্য কী করা দরকার তা যাচাই করার এখনই সময়। এই নিবন্ধটি আজ নাগা সমাজের কিছু সমস্যার আলোকে নাগাল্যান্ডের বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার একটি প্রয়াস। আশা করা যায় নিবন্ধটি আরও ভালো এবং নিরাপদ নাগাল্যান্ডের জন্য আমাদের অনুসন্ধানে আরও আলোচনার দিকে নিয়ে যাবে।

<u>সামাজিক অবস্থা</u>

নাগা সমাজ ছিল মূলত শ্রেণীহীন ও বর্ণহীন। কিন্তু আজ নাগাল্যান্ডে শ্রেণী ব্যবস্থা দ্রুত বিকাশ লাভ করছে। বিষয়াসক্তি অনেক নাগাকে গ্রাস করেছে। ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে আর গরীব আরও গরীব হচ্ছে। যারা অধিক সম্পদ সঞ্চয় করে তাদের মর্যাদা বাড়াচ্ছে, সেখানে অন্যদের সঙ্গে সম্পদ ভাগাভাগি করার নীতি ও মূল্যবোধ আজ উপেক্ষিত। আমাদের সমাজে মদ্যপানের বিষয়টিকে খুবই উঁচু চোখে দেখা হত। রোংমেই উপজাতির স্বীকৃতির বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশ থেকে অভিবাসন এবং ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে অভিবাসন নাগাল্যান্ডে প্রায় কোন সমস্যা হিসেবে দেখা হচ্ছে না।

রোংমেই সম্প্রদায় উপজাতি স্বীকৃতি চায়। তাদের সংখ্যা মাত্র ১৩১৩ জন। কিন্তু নাগাল্যান্ডের নাগা সম্প্রদায়ের জন্য একে হুমকি বলে মনে করা হয়। কতজন নাগা জানেন যে অঙ্গামি মণিপুরের একটি স্বীকৃত উপজাতি? নাগারা বহিরাগতদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে কিন্তু তাদের নিজের ভাই বোনদের অবজ্ঞার চোখে দেখে। নাগাল্যান্ডে প্রতি বছর হাজার হাজার অভিবাসী আসছে।

কতজন নাগা তাদের কাজের লোক হিসেবে 'মিয়া' বা 'নেপালি' বা 'কাচারী' নিয়োগ করেছে? তাদের মধ্যে কতজন নাগাল্যান্ডের নাগরিকত্ব পেয়েছেন এবং নাগারা তাদের গ্রহণ করেছেন? আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য আসামে প্রতিদিন ৬০০০ অভিবাসী প্রবেশ করে। বহিরাগতরা শিগগিরই

আমাদের নেতা হয়ে যেতে পারে। গুজব যদি সত্যি হয়, তাহলে তাদের মধ্যে কেউ হয়তো ইতিমধ্যেই নাগা সমাজের বিশিষ্ট নেতা হয়ে উঠেছেন।

নাগাল্যান্ড ট্রাইবাল কাউন্সিল (এনটিসি) গঠন করে বৃহত্তর নাগা পরিবারের মধ্যে 'সামাজিক অস্পৃশ্যতা' তৈরি করে। এর প্রথম প্রেসিডেন্টের লেখালিখি থেকেই বোঝা যায়, এনটিসি সহনশীল এবং সমস্ত মানুষের সংগঠন হওয়ার পরিবর্তে এনটিসি একটি অতি সংকীর্ণ নীতির উপর দাঁড়িয়ে আছে। যেন ভিন রাজ্যের নাগাদের থেকে নাগাল্যান্ডের নাগাদের রক্ষা করার জন্য এনটিসি তৈরি হয়েছে। নাগাল্যান্ডের বাইরে বসবাস করছে যে নাগা ভাই ও বোনেরা, তাদের কাছে একটা নেতিবাচক বার্তা নিয়ে যায়।

এনটিসি-র সঙ্গে মণিপুরের ইউনাইটেড নাগা কাউন্সিল (ইউএনসি)-কে এক করে দেখলে ভুল হবে। কারণ ইউএনসি তৈরি হয়েছিল মণিপুরে প্রভাবশালী মেইতি সম্প্রদায় থেকে নাগাদের অধিকার ও জীবন রক্ষা করার জন্য। মণিপুরে ইউএনসি মণিপুরে একটি বিকল্প ব্যবস্থার লক্ষে কাজ করে যা আসলে নাগাদের এক জাতি হিসাবে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা অর্জনের একটি উপায়। নাগাল্যান্ড রাজ্য বিশেষ মর্যাদা অর্জন করেছে সমস্ত নাগাদের শ্রমের বিনিময়ে। আজ, নাগাল্যান্ডের নাগাদের অবশ্যই তাদের প্রচীন ষোলো-উপজাতি মানসিকতার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে, নাগাদের সমস্ত সম্প্রদায়ের জন্য তাদের আরও পরিণত এবং উপযুক্ত হতে হবে।

নাগাল্যান্ডে পিতৃতন্ত্রে বিশ্বাস ও রাতি খুবই শক্তিশালী। সমাজের সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত রূপায়ণ নিয়ে প্রচুর সভা হয়েছে। কিন্তু নাগা সমাজের প্রথা এবং বাইবেলের নির্দেশ; দুটোই মহিলাদের জনপরিসরে আসার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অনেকগুলি সংগঠন এবং হোহো (নাগা উপজাতীয়দের সংগঠন)-র আশঙ্কা নারী সংরক্ষণের আইন নাগা সমাজ এবং চার্চের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু তারা প্রায় কখনই এই রাজ্যের দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি কথাও বলে না, যা পুরো নাগা সমাজকে ক্ষয় করে চলেছে। আমাদের সমাজে দুর্নীতি ও হিংসা আটকানোর সর্বোত্তম উপায় হলো নারীদের সুযোগ ও স্বাধীনতা দেওয়া।

রাজনৈতিক অবস্থা

দুর্ভাগ্যবশত, কিছু নাগা উপজাতি যারা ভারতের স্বাধীনতার ফল ভোগ করার ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে আছে তারা নাগা জাতীয়কারণ থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে। নাগাল্যান্ডে নাগা সম্প্রদায়ের অনেক শিক্ষিত মানুষ নাগা জাতীয় আন্দোলন নিয়ে আর কথা বলতে চান না। তাঁরা আন্দোলনে যোগ দিতে চান না। তাঁরা আন্দোলনকে টিকিয়ে রাখতে উদ্যোগী নন। তাঁরা নাগা জাতির বৃহত্তর উদ্দেশ্যে নিজেদের, তাঁদের পরিবার এবং তাঁদের গোত্রকে উৎসর্গ করতে চান না। তাঁরা 'ভারতের বিধান' নিয়ে বেশ সন্তুষ্ট বলে মনে হচ্ছে। সেটা তাঁদের দৈনন্দিন মৌলিক চাহিদা পূরণ করে এবং যারা এই 'বিধান' নিয়ে বিরক্ত করে তাদের তাঁরা অপছন্দ করেন। সময়ে সময়ে, আমরা নাগা বুদ্ধিজীবীদের 'একাকী কণ্ঠস্বর' শুনতে পাই; মৃতপ্রায় নাগা জাতীয়তাবাদের বিলাপ। সত্যিকার অর্থে, সামগ্রিকভাবে, নাগা জাতীয়তাবাদের শক্তি এবং চেতনা এখন তলানিতে ঠেকেছে।

কেউ পছন্দ করুক বা না করুক, নাগাল্যান্ডের বাইরের নাগাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নাগা জাতীয় আন্দোলন টিকে আছে। নাগাল্যান্ড রাজ্যের বাইরে নাগাদের অবস্থা করুণ। আসামের নাগা, মণিপুরের নাগা, অরুণাচল প্রদেশের নাগা এবং মায়ানমারের নাগারা সব ধরনের নিপীড়ন ও বৈষম্যের সম্মুখীন হচ্ছে। নাগাল্যান্ডের নাগা সম্প্রদায়ের অনেকে নাগা পলিটিক্যাল গ্রুপগুলোর কর্মকাণ্ডের বাড়াবাড়ির খুবই নিন্দা করে। কিন্তু ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারা সংঘটিত বাড়াবাড়ি নিয়ে নীরব। প্রতিবেশী রাজ্য মণিপুরের বিপরীতে, নাগাল্যান্ডে সশস্ত্র বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন (ঙ্চ(ঞ্চঙ) আরোপের নিন্দা করে এমন কোনো সক্রিয় আন্দোলন বা সংগঠন নেই। ঙ্চ(ঞ্চঙ বলবৎ থাকায়, নাগরিকদের রক্ষা করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কোনো ক্ষমতা নেই এবং সে কারণেই যুদ্ধবিরতি একটি উপহাস মাত্র। ঙ্চ(ঞ্চঙ যে এক ধরনের সামরিক শাসন ব্যবস্থা সে ব্যাপারে নাগা জনসাধারণ সচেতন নয়। নাগাল্যান্ডের অনেক শিক্ষিত নাগা মনে করেন, ভারতীয় সংবিধানের ৩৭১ (এ) ধারায় আওতায় থাকার ফলে নাগাল্যান্ড নিরাপদ ও সুরক্ষিত। এটি আসলে অদূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গী। নাগা জাতীয় আন্দোলন বিলুপ্ত হলে এই বিধান কতদিন চলবে? কেন্দ্র সরকার কি চিরকাল অর্থের যোগান দিয়ে যাবে? কেন্দ্রে বিজেপি আসার সঙ্গে সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল হয়েছে। অদুর ভবিষ্যতে কেন্দ্র সরকার গোটা দেশে এক জাতি, এক সংস্কৃতি এবং এক আইন (অভিন্ন দেওয়ানি আইন) সকল নাগরিকের জন্য কার্যকর করবে। তখন ৩৭১ (এ) ধারার বিলুপ্তি ঘটতে

পারে। সেটা নাগাদের অনন্য মর্যাদার উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। এই বিশেষ বিধান বাতিল হলে নাগাদের অনন্য মর্যাদাও চলে যাবে। অতএব, এটাই অপরিহার্য যে আমরা সকলে হাতে হাত মিলিয়ে সমগ্র নাগাদের জন্য একটি 'সম্মানজনক সমাধান' অন্বেষণ করি এবং নাগা জাতির অধিকার রক্ষার জন্য সম্মিলিত সংগ্রাম করি।

অর্থনৈতিক অবস্থা

কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানত বিদ্রোহ দমনের নামে প্রতি বছর রাজ্যে কোটি কোটি টাকা ঢেলে দেওয়ায় নাগাদের স্বনির্ভর অর্থনীতি দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এর দরুন অনেক নাগার জীবন সহজ এবং সচ্ছল হয়েছে। আমাদের জীবন ক্রমেই ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে। একজনের আয়ে যতটা সম্ভব তার চেয়ে ব্যয়সাধ্য জীবনযাপন করি। আমাদের প্রজন্ম তাই, শারীরিকভাবে (কায়িকশ্রম) এবং মানসিকভাবে (প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অন্যদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য) কঠোর পরিশ্রম করতে ইচ্ছুক নয়।

সম্প্রতি সমাপ্ত অল ইন্ডিয়া প্রি-মেডিকেল টেস্টে নাগাল্যান্ডের কোনো নাগা শিক্ষার্থী বরাদ্দকৃত ৫৬টি আসনের একটিও পূরণ করার জন্য পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি, যেখানে মণিপুরের ২৪২ জন শিক্ষার্থী ১৩১ জনের জন্য মেধা তালিকায় নির্বাচিত হয়েছিল। বেশিরভাগ নাগা শিক্ষিত যুবক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য বাইরে যেতে চায় না কিন্তু চাকরির জন্য শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের উপর নির্ভর করে। এই 'নির্ভরশীলতা সিনড্রোম' বন্ধ করা দরকার। কারণ এটি রাজ্যের অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ পতনের দিকে নিয়ে যাবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে নাগাল্যান্ড বিশেষ অর্থনৈতিক উন্নয়ন অঞ্চল (ঞ্জ(ঙ্গঠ) চালু করা হচ্ছে। এতে নাগাদের অর্থনীতির অপূরণীয় ক্ষতি হবে এবং সামাজিক সমস্যা তৈরি হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ এবং প্রকৃতি-পরিবেশের মূল্যে গুটিকয়েক ধনী ব্যক্তিই এর সুবিধা পাবে। সাধারণ মানুষ তাদের জীবিকা হারাবে, তাই বেকারত্ব বাড়বে।

দশ জনকে চাকরি দিতে হাজার মানুষের জীবিকা ধ্বংস করাকে 'উন্নয়ন' হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। পুরো বন কেটে লাখ লাখ টাকা পাওয়া প্রকৃত 'বৃদ্ধি' নয়। বোতলজাত জল জীবনের বেসরকারিকরণের লক্ষণ। আজ আমাদের যা প্রয়োজন তা হল আমাদের জমি, জল এবং বনকে ধনবান কোম্পানিগুলোর হাতে পড়া থেকে রক্ষা করা। যতদিন আমরা জমি, বন ও জলের উৎসের মালিক থাকব, ততদিন আমাদের বেঁচে থাকার স্বাধীনতা থাকবে।

রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারকদের অবশ্যই যে কোনো ধরনের বাণিজ্যিক ফসল বা গাছ চাষ বা রোপন করার আগে দুবার ভাবতে হবে। কৃষকদের সাহায্য করার পরিবর্তে দ্রুত অর্থকরী ফসলের প্রবর্তন নাগা কৃষকদের ঋণগ্রস্থতা এবং খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। গ্রামবাসী তথা কৃষকদের কল্যাণ রাষ্ট্রীয় নীতির সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। যেসব গ্রামবাসী খাদ্য বা ফসল উৎপাদন করে তাদের প্রণোদনা দিতে হবে। যতদিন আমরা নিজেদের খাদ্য উৎপাদন করতে পারব ততদিন আমরা স্বাধীন মানুষ। বহিরাগত বা কোম্পানির কাছে খাদ্যের সার্বভৌমত্ব হারিয়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা মিশরের জ্যাকবের পুত্রদের মতো তাদের দাস হয়ে যাব। খাদ্যের নিয়ন্ত্রণ যাদের হাতে, তারাই মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ধর্মীয় অবস্থা

আমাদের নাগা গীর্জাগুলো আধ্যাত্মিক মনন সমৃদ্ধ খ্রিস্টান তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে। আমরা নবী নাথানকে তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছি যিনি পরাক্রমশালী রাজা ডেভিডকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। আমরা নবী আমোস এবং হোসাই তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছি, যিনি ধনী ও অভিজাত শ্রেণীর দ্বারা সমাজের দরিদ্র মানুষদের অমানবিককরণকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। আমরা দায়ীত্বশীল খ্রিস্টান তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছি যারা প্রতিদিন তাদের ক্রুশ তুলে নেবে এবং খ্রীষ্টকে অনুসরণ করবে। আমরা যীশুর মৌলিক চরিত্রকে প্রতিস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছি।

আমরা গান, প্রার্থনা এবং প্রচারের মাধ্যমে ঈশ্বরের উপাসনা করতে পছন্দ করি, কিন্তু আমাদের বিশ্বাসকে কাজে লাগাই না, আমরা আসলে ধর্মীয় ভণ্ড হয়েই থেকে যাই। আমরা অনেক 'ভিখারি খ্রিস্টান' তৈরি করেছি যারা সর্বদা ঈশ্বরের কাছে নিজের জন্য কিছু না কিছু চাইতে থাকে। তারা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয় না এবং তাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গেও ঈশ্বরের আশীর্বাদ ভাগ করে নেয় না। আমাদের অনেক পক্ষাঘাতগ্রস্ত খ্রিস্টান আছে যারা বিশ্বাস করে 'ঈশ্বর সবকিছুই ভাল করবেন।' এই বিশ্বাস অনেক নাগা খ্রিস্টানকে অলস এবং কর্মহীন করে তুলেছে। তারা সর্বদা সর্বদা সর্বাবস্থায় ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের জন্য অপেক্ষা করে। এই কারণেই আমাদের সমাজে সব ধরনের অপকর্ম ঘটে চলেছে। সমাজ পরিবর্তনের

জন্য ঈশ্বরের মানুষের প্রয়োজন এবং মানুষের ঈশ্বরের শক্তি প্রয়োজন।

আমাদের বুঝতে হবে যে ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্ট মানুষের পরিচর্যা, মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের মাধ্যমে আমাদের জন্য সর্বোত্তম কাজ করেছেন। নাগা খ্রিস্টানরা কি ধর্ষণ, হিংসা, দুর্নীতি, স্বজনপোষন এবং উপজাতীয়তার ক্রুশে যীশুর রক্তপাত দেখতে চায়? ঈশ্বরের জন্য সর্বোত্তম কাজ করা এখন আমাদের কর্তব্য। সময় এসেছে নাগা খ্রিস্টানদের উঠে দাঁড়ানোর এবং সাহসের সাথে বলার, 'যাই হোক না কেন, আমি ঈশ্বরের জন্য সেরাটা করব'। এখন আমাদের কষ্ট, ত্যাগ স্বীকার করার এবং বিশ্বকে পরিবর্তন করার সময়। সে লক্ষ্যে ঈশ্বর আমাদের সাথে থাকবেন।

শেষের কথা

নিবন্ধটা সারসংক্ষেপ করলে দাঁড়ায় প্রথমত, অনেক নাগাই (বিশেষ করে বয়স্করা) জানেন না যে 'গতকাল' আর 'আজ' নয়। কোনো পরিবর্তন ছাড়াই তারা আমাদের সমাজকে ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও অনুশীলন (চার্চ এবং সমাজ উভয় ক্ষেত্রেই) দিয়ে চালাতে চায়। এই দলটি যেকোন পরিবর্তনের বিরোধিতা করে। প্রাচীন জ্ঞান ব্যবস্থাকে প্রাসঙ্গিক ও অর্থবহ করতে হলে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে তা আমাদেরকে ব্যাখ্যা ও পুনর্ব্যাখ্যা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, অনেক নাগা নেতা তরুণ প্রজন্মের জন্য চিন্তা-ভাবনা করাকে গুরুত্ব দেন না। তাঁরা অদূরদর্শী। ১০ বা ২০ বছর পরে কি হবে? দুঃখের বিষয়, এমনকি নাগা জাতীয়তাবাদও ধ্বংসের পথে।

তৃতীয়ত, অনেক নাগা বস্তুবাদে অন্ধ। তারা 'সম্পদ'কে তাদের দেবতা হিসাবে পূজা করে এবং বিশ্বাস করে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সকল সমস্যার সমাধান। মোটা বেতনের চাকরির সফলতা। দুর্নীতি ও প্রকৃতি ধ্বংসের সঙ্গে জড়িত হওয়া তাদের লক্ষ্য।

চতুর্থত, নাগা খ্রিস্টানদের মধ্যে ঈশ্বরকে 'বেসরকারীকরণ' করার সমস্যা রয়েছে। তার ফলে যীশু খ্রিস্টের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে তারা সামাজিক কর্মকাণ্ডে রূপান্তরিত করতে ব্যর্থ হয়। তারা 'লবণ' এবং 'আলোর' ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়; বিশ্বের সমস্ত ধ্বংসাত্মক শক্তিকে আমাদের সমাজে আক্রমণ চালানোর সুযোগ করে দেয়।

(নিবন্ধটি morungexpress.com -এ প্রকাশিত)

ব্রাত্য পরিবেশ কথা

দীপায়ন দে

বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক মহাযজ্ঞ শেষ হল; সাধারণ নির্বাচন। ডান, বাম, মধ্যপন্থী কারও নির্বাচনী ইস্তেহারেই কিন্তু চোখে পড়লো না কোনো পরিবেশ-কথা। জলবায়ু পরিবর্তন আর বিশ্ব উষ্ণায়নের কালে, যখন আর্থ-সামাজিক প্রতিটি বিষয়ের সিদ্ধান্ত ও সমীক্ষায় জলবায়ু একটা নির্ণায়ক উপাদান, তখন কেন যে কেউ পরিবেশ নিয়ে 'রা' কাড়ল না সেটা অবশ্যই বিবেচনার বিষয়। কেন কেউ পরিবেশ নিয়ে কথা বলতে চায় না? আর কেউ শুনতেও চায় না, কেন? পরিবেশ কিছু অত্যুৎসাহী ভলেন্টিয়ার পরিবেষ্টিত হয়ে পাড়ায় পাড়ায় গাছ লাগানো, জল বাঁচানো, সাফ-সাফাই আর 'প্লাস্টিক হটাও'তে পরিসীমিত হয়েই থেকে যায়। কেন? পরিবেশ নিয়ে সংসদে যারা বাছাই করা প্রশ্নবাণ চালান, আদালতে জুতোর সুখতলা খোয়ান অথবা তথ্যচিত্র তৈরী করেন, তাঁরা নির্দিষ্ট কিছু মানুষ। তাঁদের নির্দিষ্ট কিছু এজেন্ডা আছে। তাঁরা জনসাধারণ বলতে যা বোঝায়, ঠিক তা নন। আমরা এখানে আপামর জন সাধারণের কথা বলতে চাইছি। যারা এই বৃহত্তম গণতন্ত্রের ভোট ব্যাঙ্ক। আর বলতে চাইছি, সেই ভোটে জয়ী নেতা- মন্ত্রীদের কথা, যাদের হাতে সযত্নে তুলে দেওয়া হয় দেশভার। সেইসব নেতা- মন্ত্রীরা যদি দায়ে পড়ে পরিবেশ প্রসঙ্গে কখনও কোন কথা বলেনও, তো তাও শুধু ছাত্রছাত্রীদের উদবুদ্ধ করবার জন্য, সেই একই গঁতে, 'গাছ লাগাও, জল বাঁচাও, সাফ রাখ, ভাল থাকো'। তাঁদের মুখে কখনই শুনতে পাই না, দেশের বন সংরক্ষন নীতিমালার কথা, জলাভুমি সংরক্ষনের রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর কথা, কার্বননীতি এবং জলবায়ু অর্থনীতির বর্তমান প্রেক্ষিতে দেশের জাতীয় অবস্থান, অথবা জৈব বৈচিত্রের চোরা চালান রুখতে নব্যনির্মিত আইনের কথা। অথচ, দেশের নেতা- মন্ত্রীদের হাতেই নিয়ত এই সব নীতির প্রণয়ন হয়, সেই নীতিমালা রূপায়িত হয়। কর্মকান্ডে এবং সংবাদপত্রে তা সম্বন্ধে আমরা অবগত হই, তারপর গদগদ হই। জানতেও চাই না, কেন হল, কবে হল, কাকে জিগ্যেস করে হল? যদিও, এই প্রশ্ন তোলা আমাদের সাংবিধানিক অধিকার। এই অব্যক্ত পরিবেশ-কথার

অন্ধকারে রাতারাতি সাফ হয়ে যায় কয়েক'শ বর্গ কিলোমিটার পরিপুষ্ট অরণ্য, আমরা সংবাদ পাই চওড়া রাস্তা তৈরি হল। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জলাভুমি বুজে যায়, আমরা শুনি বহুমঞ্জিলা 'মল' উদ্বোধন করলেন বলিউড তারকা, এবং সেখানে ৫০ু ছাড়ে বিক্রি হচ্ছে জামাকাপড়। আমরা ছুটি। কিন্তু প্রশ্ন করি না, কথা তুলি না। অস্ট্রীয় কবি এরিখ ফ্রীড প্রশ্ন তুলেছিলেন। বলেছিলেন, 'পারে কি কোনো বিশ্ব, যা হয়তো বা তার দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের কারণে ধ্বংস হবে, কোন কবিতাকে বিধান দিতে?' পারে না, আমরা জানি। পরিবেশকেও কেউ বিধান দিতে পারে না। সেই জন্যই কি চুপ করে থাকে সবাই। তাই প্রথম প্রশ্নটাই করা দরকার যে, কেন আজও ব্রাত্য পরিবেশ-কথা।

প্রকৃতির অবিমৃষ্যকারিতা

ডারউইন সাহেব তাঁর গ্যালাপাগোস দ্বীপমালা ভ্রমণের সময় দেখেছিলেন যে, অতলান্তিকের একটা অয়েস্টার বছরে প্রায় আশি কোটি ডিম পাড়ে। তার প্রায় ৯০%নষ্ট হয়ে যায়, তবুও পরে থাকে কয়েক কোটি ছানা পোনা। তার বিবর্তন তত্ত্বে তিনি বলেছিলেন প্রকৃতির এই অবিমৃষ্যকারিতার কথা। বলেছিলেন যে প্রকৃতি যখন দেয় তখন সে ভাবে না, অগাধ দেয়, যাতে এই জৈববৈচিত্র যেন 'থাকে দুধে ভাতে'। আমরা প্রকৃতির এই অপর্যাপ্ততায় বেড়ে উঠেছি বলে ধরেই নিই যে প্রকৃতির রসদ অফুরান, বিশ্বাস হয় না যে এক দিন ভাঁড়ারে টান পরতে পারে। অতএব, 'জল সংরক্ষন করা দরকার, গাছের রসদ যোগান রাখা দরকার' এগুলো শহুরে মানষিকতায় নিতান্তই অবান্তর বলে মনে হয়। নিছক ভাববিলাস। টাকা দিলেই সব পাওয়া যাবে। টাকা যেন না ফুরিয়ে যায়। তাই, পরিবেশ সংরক্ষণ সামাজিক পদমর্যাদার প্রতীক হয়েই রয়ে যায়। সেই নিয়ে আর কথা হয় না। কিন্তু কথা হয় গরিবখানায়, যেখানে প্রকৃতির ওপর ভরষা করে সংসার চলে। মায়েদের উনানের কাঠ, পুকুরের মাছ, খেতের চাল আর চালের খড়ে যখন টান পরে, তখনই 'চিপকো আন্দোলন' হয় গ্রামে গঞ্জে। শহরে নয়। শহরে হয় তার প্রতীকি প্রদর্শন মাত্র। সেখানে যাই কম পড়ুক, টাকা কম পড়তে দেওয়া হয় না। তাই পরিবেশ নিয়ে কথার সময় কম পরে যায় সবার।

গেরস্তের খোকা হোক

শৈশবে একবার একটা হলুদ পাখির ডাক শুনিয়ে দাদু বলেছিলেন, 'কি বলছে বলতো পাখিটা? বলছে, গেরস্তের খোকা হোক'। দাদু ছিলেন গণিতজ্ঞ, নৃতত্ত্ববিদ। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন যে সাধারণ মানুষ মনে করে, গেরস্তের ঘরে খোকা হলে কত লাভ হবে, তার আয় বাড়বে, সামাজিক মর্যাদা বাড়বে, বিষয় সম্পত্তির বিস্তার হবে, এক কথায় বৈভব ফিরবে। এই লাভের হিসেব কষতে কষতে মানুষ ভুলে গেছে পাখিটার কথা, তার বাস্তুতন্ত্রের কথা, পরিবেশের কথা। শুধু মনে রয়ে গেছে, গেরস্তের খোকা হোক। আর সেই খোকার আশায়, লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে জনসংখ্যা বছরের পর বছর। সেই খোকারা এখন বড় হয়েছে। তারাই এখন ব্যাস্ত বৈভব সংকলনে। তারাই আবার এখন দোষারোপ করে পিতৃপুরুষদের; এতো খোকার কি দরকার ছিল। তাই, এই মনকষ্টে তাদেরই বা সময় কই পরিবেশ-কথার কথা পাতার।

পরিবেশ মানেই আতঙ্ক

যাকেই বলি, সেই বলে 'পালা পালা' ওই এলো ক্লাইমেট চেঞ্জ। আরে বাবা পালাবেটা কোথায়। কিন্তু সেকথা ভাবার তো তার সময় নেই। সে ভাবে, ওই বুঝি এল ঝড় আর প্লাবন। এই ক্লাইমেট আতঙ্কের জনক অনেকটাই সংবাদমাধ্যম এবং সমাজমাধ্যম (সোস্যাল মিডিয়া)। আর আছে কিছু সুবিধাবাদী ব্যাবসাদার যারা এই ভয় ভাঙ্গিয়ে খাচ্ছে। এ কথা বোঝাবে কে? পরিবেশ-কথার যে সময়ই হয় না। কেউ শুনতেই চায় না, যে জলবায়ু পরিবর্তন ঋতুচক্রের মতনই একটা পার্থিব প্রপঞ্চ। একটা ঘটমান বিষয়। পৃথিবীর বুকে কোটি কোটি বছর ধরে, বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং তুষার যুগের প্রবর্তন একটা চক্রব্যত্যয় ঘটে চলেছে। এই চক্রব্যত্যয়কে বলা হয় গ্লেসিয়েসন। আমরা সাধারণ ভাষায় তুষার যুগ বলে থাকি। উষ্ণায়ন এবং তুষারাচ্ছাদন দুটো উপর্যুপরি পর্যায়। দুয়ের মাঝের অবস্থাকে বলা হয় আন্তগ্লেসিয়াল পর্ব। এখন আমরা যে তুষার যুগের আন্তগ্লেসিয়াল উষ্ণায়ন পর্বে আছি, তার নাম কোয়াটারনারি তুষারযুগ (বাগ্লেসিয়েসন)। এর আগের তুষার যুগ শেষ হয়েছে মাত্র এগারো হাজার সাতশো বছর আগে এবং সেই যুগের হিমাচ্ছাদন গলতে শুরু করেছিল প্রায় এক লক্ষ

পনেরো হাজার বছর আগে। মজার কথা হল, সেই তুষার যুগেও মানুষ ছিল। তাঁরা ছিল আফ্রিকায়। তুষার যুগের অবসানের পরে তাঁরা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেই তুষার যুগে বিশ্ব উষ্ণায়নের পরিশেষে যে মহাপ্লাবনের উল্লেখ করা হয়, প্রমাণ আছে যে মানুষ সেই প্লাবনের ইঙ্গিত পেয়েছিল এবং সতর্কভাবে নিজেদের রক্ষা করতে সমর্থও হয়েছিল। মাঝেমধ্যে মনে হয়, সেই সব মানুষেরা ডিজিটাল প্রযুক্তি বা কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আমাদের মত এমন মেতে ওঠেননি বলেই হয়তো সাধারণ মগজ ঘেঁটে বাঁচার বুদ্ধি বের করতে পেরেছিলেন। তাঁরা নিশ্চয়ই পরিবেশ নিয়ে ভাবতেন। সময়ও দিতেন।

<u>হাতে রইলো পেন্সিল</u>

এতো কথা বলেও সেই হাতে রইলো পেন্সিল। যার বুকটা গ্রাফাইটের আর শরীর কাঠের। অর্থাৎ দুটোই কার্বন। আর এই কার্বনই আমাদের অজ্ঞতার দেহবন্দি কফিনের শেষ পেড়েক। যেদিন মানুষ জেনেছে যে বিশ্ব ঊষ্ণায়নের পেছনে হাত রয়েছে কার্বন নির্গমনের এবং কার্বন প্রতিরোধ করতে পারলেই নাকি পিছু হটবে উষ্ণায়ন, সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে কার্বনের ভেলকিবাজি। কার্বন ক্রেডিট, কার্বন ফিন্যান্স, কার্বন বাজার, ক্যোটো প্রটোকল, কতকি। আসলে কার্বন ব্যাবসা। এই ব্যাবসার সবটাই প্রায় শেয়ার বাজারের মতন। রাতারাতি নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে মানুষ, বিক্রি হয়ে যেতে পারে দেশ। যদি বুঝতে না পারে, এই কার্বন কল আসলে কার্বাঙ্কল। কিন্তু কে কার কথা শোনে? মনে পরে যায় একজন ব্রিটিশ ব্যারনেস মহিলার কথা, তিনি ব্রিটেনের প্রথম প্রাইমেটোলজিস্ট এবং নৃতত্ত্ববিদ জেনগুডঅল, যিনি পরিবারের সব কাজ সেরে তারপর বিজ্ঞানচর্চা করতেন, বুঝতে চেস্টা করতেন শিম্পাঞ্জির কথোপোকথন। তিনি বলেছিলেন, 'তুমি যা করবে তাতেই তফাত ঘটবে অনেক, কিন্তু ভাবতে তোমাকেই হবে যে কোন তফাতটা তুমি চাও, আর কি চাও না।' সেই ভাবনাটা আমরা আর কবে ভাববো?

আজ থেকে প্রায় বাহান্ন বছর আগে, ১৯৭২-এর জুন মাসে প্রথম পরিবেশ-কথা হয় রাষ্ট্রসঙ্ঘে, দ্য হ্যুমান এনভিরনমেন্ট কনফারেন্স, প্রকাশিত হয় রোমের পরিবেশ গোষ্ঠীর চাঞ্চল্যকর প্রতিবেদন 'বৃদ্ধির সীমারেখা' (লিমিটস অফ গ্রোথ) এবং সেই বছর ডিসেম্বরেই এপোলো ১৭ অন্তরিক্ষ থেকে প্রথম ছবি পাঠায় পৃথিবীর। ঠিক যেন একটা নীল মার্বেল। নাসার এক মহাকাশচারী বলেছিলেন, 'এই নীল মার্বেলটাকে সামলে রেখো বন্ধু, এটা চলে গেলে যে আর খেলারই জায়গা থাকবে না'। প্রশ্ন সেটাই, এই নীল মার্বেলটাকে সামলে রাখার দায়িত্ব আজ কার? তোমার না আমার? নাকি আমাদের?

শাসকের সঙ্গে সংঘাত ও বিচারালয়ের বাড়াবাড়ি

মজিবুর রহমান

পশ্চিমবঙ্গে শাসকের সঙ্গে আদালতের সংঘাত লেগেছে। অন্তত তিন বছর ধরে এই লড়াই জোরকদমে চলছে। প্রশাসনিক হেডকোয়ার্টার নবান্ন আর কলকাতা হাইকোর্টের কাজিয়া সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে জমা পড়ছে। দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার শিকার হচ্ছে রাজ্যের লাখ লাখ সাধারণ মানুষ। সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি হচ্ছে।সাংঘাতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষার মতো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্ষেত্র। এই পরিস্থিতির জন্য সরকার ও আদালত উভয়েরই দায় রয়েছে। কেউই সমস্যার সমাধানে আন্তরিক নয়। বরং সমস্যাকে জটিল থেকে জটিলতর ও দীর্ঘমেয়াদি করা হয়। এখানে তিনটি বিচারবিভাগীয় নির্দেশ ও সেগুলোর অভিঘাত নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

বিগত কয়েক বছরে রাজ্যের সরকারি বিদ্যালয় গুলোতে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় নানান ধরনের নিয়ম ভঙ্গের ঘটনা ঘটেছে। অজ্ঞতাবশত বা অনিচ্ছাকৃত ভুল নয় , বেশ পরিকল্পনা করে নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে বিভ্রাট ঘটানো হয়েছে। স্বজন পোষণ ও বিশাল অঙ্কের আর্থিক লেনদেন হয়েছে।পুরো ঘটনাটা একটা প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন সাংসদ, বিধায়ক, মন্ত্রী, সরকারি আধিকারিক ও শাসক দলের নেতাকর্মীরা। গত দুই বছরে ২৫-৩০ জনকে ধরা হয়েছে। ২০১৬ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্যানেলে উত্তরপত্র

তথা অপটিক্যাল মার্ক রেকগনিশন (ও এম আর) শীট বিকৃতি, সিরিয়াল ব্রেক, প্যানেলের বাইরে থেকে নিয়োগ, সুপার নিউমেরিক পোস্ট সৃষ্টি সহ বেশ কয়েক রকমের অনিয়মের সন্ধান পাওয়া গেছে। ওই প্যানেল থেকে ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিযুক্ত হন। তদন্তের স্বার্থে সকলের নথিপত্রের হার্ডকপি জেলায় জেলায় ডিআই অফিসে অথবা কলকাতায় মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অফিসে জমা করা হয়। ফোনের মাধ্যমেও তথ্য প্রদান করা হয়। সবকিছু যাচাই করে দেখা যায়, নিয়ম ভঙ্গ করে নিয়োগপত্র পাওয়া শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা আট হাজারের কম আর নিয়ম মেনে নিযুক্ত হয়েছেন আঠারো হাজারের বেশি। অর্থাৎ বৈধ শিক্ষকের সংখ্যা অবৈধ শিক্ষকের থেকে অনেকটাই বেশি। কাঁকড় বেছে ফেলার পর খাদ্য শস্য ভক্ষণ করাই সাধারণ নিয়ম। জমি থেকে আগাছা পরিষ্কার করে আমরা সবাই ফসল রক্ষা করি। আগাছার সাথে ফসল কেটে ফেলি না। কিন্তু কলকাতা উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ নিয়োগ মামলার রায় দিতে গিয়ে আগাছার সাথে ফসলও কেটে ফেলার নিদান দিয়েছে।কাঁকড় না বেছে সমস্ত শস্য কণা ডাস্টবিনে ফেলার ফতোয়া জারি করেছে। ২০১৬ সালের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সব প্যানেল বাতিল। 'ঢাকি সমেত বিসর্জন'।সকলের চাকরি ক্যানসেলড। এটা কোনো বিচার হল? ন্যায়বিচারের কোনো উপাদান কি এই রায়ের মধ্যে রয়েছে? বৈধ ও অবৈধ ভাবে নিযুক্ত উভয়েরই এক পরিণতি! মুড়ি-মিছরির এক দর! ডিভিশন বেঞ্চ সাফাই দিয়েছ, বারবার বলা সত্ত্বেও নাকি নিয়োগ প্রক্রিয়ার দুই প্রধান সংস্থা স্কুল সার্ভিস কমিশন ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদ আদালতের কাছে বৈধ ও অবৈধ কর্মপ্রার্থীদের তালিকা জমা দেয়নি।তাই আসল ও নকলকে আলাদা করা যায়নি। কিন্তু প্রশ্ন হল, কমিশন ও পর্ষদ ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করেনি বলে বৈধ চাকরিজীবীরা বরখাস্ত হয়ে যাবেন? যারা আদালতের সঙ্গে সহযোগিতা করেনি আদালত তাদের শাস্তি দিক। তাদের বাধ্য করুক প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে। কমিশন ও পর্ষদের দু'চারজন আধিকারিককে বাগে আনতে না পেরে হাজার হাজার চাকরিজীবীকে ব্যতিব্যস্ত করার কোনো মানে হয়? আজকের দিনে একটা সরকারি চাকরি পাওয়া 'ভগবানের সাক্ষাৎ' পাওয়ার সমান! অথচ বৈধভাবে অর্জন করা চাকরিকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। ২০১৬ সালের প্যানেলে এমন অনেকেই আছেন যাঁরা ২০১১ সালের প্যানেলের চাকরি ছেড়ে এসেছেন। মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের প্যানেল থেকে পাওয়া চাকরি ছেড়ে এসেছেন।অন্য কোনো পেশার চাকরি ছেড়ে এসেছেন। অর্থাৎ এঁরা একাধিকবার সফলভাবে যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে চাকরি করছিলেন।আদালত কোনো বাছবিচার না করে সকলকেই বাতিল করে দিল। ভেবে দেখা হল না, একটি চাকরি একটি নিম্নবিত্ত অথবা মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ! চাকরি করার সুবাদে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে বহুজন গাড়ি বাড়ি করেছেন। বেতন থেকে ঋণের কিস্তি মেটানো হয়। হঠাৎ বেতন বন্ধ হলে তাঁরা কিভাবে ঋণ পরিশোধ করবেন? সুদ সহ বেতন ফেরতের নির্দেশ আরও মারাত্মক।ক'জন এই নির্দেশ পালন করতে পারবেন, সন্দেহ আছে। অনেকেই ভিটেমাটি ছেড়ে পালাবেন। আত্মহননের পথ বেছে নিতে বাধ্য হবেন। একসঙ্গে এতজন শিক্ষক চাকরিচ্যুত হলে স্কুলগুলোর অবস্থা কী হবে কেউ কি ভেবে দেখেছে? এখন রাজ্যের অধিকাংশ স্কুলে শিক্ষার্থীর তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা অনেক কম। স্কুল ফান্ড থেকে যৎসামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করে জোড়াতালি দিয়ে চলছে। এই মুহূর্তে অনেক স্কুলে ২০১৬ সালের প্যানেলের শিক্ষকই বেশি। একসঙ্গে অর্ধেক শিক্ষক বিদায় নিলে স্কুলগুলো চলবে কী করে! নতুন নিয়োগের ব্যাপারে কোর্টের কোনো কড়া নির্দেশনা নেই, শুধু বাতিলের বেলায় বড় বড় বক্তব্য! সরকারি স্কুল ছেড়ে মেধাবী ও আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন পরিবারের ছেলেমেয়েরা সব প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে চলে যাচ্ছে। শিক্ষার বেসরকারিকরণ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যেই কি কোনো বৃহত্তর ষড়যন্ত্র চলছে?

মুর্শিদাবাদ জেলার একটি হাইস্কুলের একজন প্রধানশিক্ষক স্কুল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ পত্র ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নিয়োগপত্র জাল করে তাঁর ছেলেকে নিজের স্কুলেই চাকরিতে ঢোকান। কোর্টের নির্দেশে সিআইডি তদন্ত করে। অভিযুক্ত পিতা-পুত্র ও দুজন শিক্ষা আধিকারিক কারাবাস

ভোগ করেন। এসব ২০২২-২৩ সালের ঘটনা।এই নিয়োগ কেলেঙ্কারির প্রেক্ষাপটে এবছর মে মাসের দ্বিতীয়ার্ধে রাজ্যের সমস্ত হাইস্কুলের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকার নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য পোর্টালে আপলোড করার নির্দেশ দেওয়া হয়। হার্ডকপি ডিআই অফিসে জমা করতে বলা হয়। নথিপত্রে শিক্ষকদের সেল্ফ অ্যাটেসটেড করতে বলা হয়।এই কাজ করার জন্য স্কুলগুলো এক সপ্তাহের মতো সময় পায়। তখন রাজ্যে গরমের ছুটি ও লোকসভা নির্বাচন চলছিল। গ্রীষ্মাবকাশে অনেকেই চিকিৎসা করাতে অথবা ঘুরতে ভিন রাজ্যে বা বিদেশে যান।একটা পুরনো ঘটনায় দীর্ঘাবকাশের মধ্যে এমন জরুরি ভিত্তিতে নথিপত্র চাওয়ার কোনো যুক্তি থাকতে পারে না। এই ধরনের আকস্মিক নির্দেশে অফিস আদালতের স্বেচ্ছাচারী মানসিকতাই প্রকাশ পায়।পশ্চিমবঙ্গে এখন দশ হাজার হাইস্কুলে দেড় লাখ শিক্ষক আছেন। মাত্র একজন শিক্ষকের নিয়োগের ক্ষেত্রে গুরুতর জালিয়াতির অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে।কারা এর সঙ্গে জড়িত তাও জানা গেছে। আইন অনুযায়ী তাদের যত কড়া শাস্তি দেওয়া যায় দেওয়া হোক। কিন্তু একটা স্কুলের একজন শিক্ষকের অপরাধের জন্য রাজ্যের হাজার হাজার স্কুলের লক্ষাধিক শিক্ষককে তদন্তের আওতায় টেনে আনার কোনো মানে হয়? একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনার জন্য এখন সবাইকেই সন্দেহ করতে হবে? বিড়ম্বনায় ফেলতে হবে? বিশ-ত্রিশ বছর চাকরি করার পর আবার নথিপত্র দেখাতে হবে? মশা মারতে কামান দাগা হচ্ছে!

গত ২২শে মে কলকাতা হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ ২০১০ সালের পর থেকে রাজ্য সরকারের প্রদান করা সমস্ত ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল বলে রায় দিয়েছে। ২০১১ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বর্তমান রাজ্য সরকারের আমলে প্রায় পাঁচ লক্ষ ওবিসি সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে। হাইকোর্ট এগুলোকে বাতিল ঘোষণা করেছে। ইতিমধ্যে এই সার্টিফিকেট ব্যবহার করে যে সুবিধা ভোগ করা হয়েছে তার ওপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব না পড়লেও পরবর্তীতে অনুরূপ ছাড় আর পাওয়া যাবে না। রায়ে বলা হয়েছে, ১৯৯৩ সালের অনগ্রসর শ্রেণী কমিশন আইন অনুযায়ী ওবিসি'র তালিকা তৈরি করতে হবে। ঘটনা হল, ১৯৯৩ সালের আইন অনুযায়ী ২০০৯ সালে কিছু জনগোষ্ঠীকে ওবিসি হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং তাদের জন্য শিক্ষা ও চাকরিতে সংরক্ষণ চালু করা হয়।এই জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই ছিল মুসলমান। ২০১২ সালে আরেকটি আইন তৈরি করে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর তালিকায় আরও কিছু জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।এদেরও অধিকাংশই মুসলমান। ওবিসি'র তালিকায় ধাপে ধাপে জনগোষ্ঠী সংযোজন একটি স্বাভাবিক ঘটনা।ওবিসি'র তালিকায় জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ওবিসি'র জন্য সংরক্ষণ কিন্তু বাড়েনি। সংরক্ষণের হার বাড়েনি বলে ওবিসি'র সুবিধাভোগীদের মধ্যে শুধুমাত্র প্রতিযোগিতা তীব্রতর হয়েছে।বিষয়টি এভাবে দেখা যেতে পারে একটি ওবিসি সংরক্ষিত পদের জন্য ২০১২ সালের আগে হয়ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পেত পাঁচটি জনগোষ্ঠী, এখন পায় সাতটি। এছাড়া এর আর কোনো তাৎপর্য নেই। আদালত ২০১০ সালের পরের সমস্ত ওবিসি শংসাপত্র বাতিল করলেও ২০১২ সালের যে আইনের ভিত্তিতে শংসাপত্রগুলো প্রদান করা হয়েছিল সেই আইনকে কিন্তু বাতিল করা হয়নি। ২০১২ সালের আইন যদি অসাংবিধানিক না হয় তবে সেই আইন অনুযায়ী ইস্যু করা সার্টিফিকেট কেন বাতিল হবে? ২০১২ সালের আইন যদি বেআইনি না হয় তবে ১৯৯৩ সালের আইনকে কেন ভিত্তিভূমি ধরতে হবে? একই বিষয়ে যদি একাধিক আইন থাকে তবে তো সর্বশেষ আইনকেই অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা।এক খোঁচাতেই পাঁচ লাখ মানুষের সার্টিফিকেট ক্যানসেল করে দেওয়া হল। কিন্তু ভেবে দেখা হল কি ওই সার্টিফিকেট পেতে কী পরিমাণ কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে? কত সাপোর্টিং ডকুমেন্ট সংগ্রহ করতে হয়েছে? হঠাৎ করে এত সংখ্যক সার্টিফিকেট বাতিল হওয়ার ফলে অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে। চাকরিতে যে 'হান্ড্রেড পয়েন্ট রোস্টার' অনুসরণ করা হয় তাতে ওবিসি'র জন্য সতের শতাংশ সংরক্ষণ থাকে।বিগত বারো-চোদ্দো বছরের সমস্ত সার্টিফিকেট বাতিল হবার ফলে সংরক্ষিত আসনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মপ্রার্থী পাওয়া কঠিন হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওবিসি শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত আসন কোনভাবেই পূরণ হবে না। ওবিসি'দের জন্য যে ছাত্র বৃত্তি

রয়েছে তাতে কেউ আবেদনকারী হতে পারবে না। তফসিলি জাতি ও তফসিলি জনজাতির সঙ্গে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর আর্থ-সামাজিক পশ্চাৎপদতার দিক থেকে বিশেষ পার্থক্য নেই। ফারাক যেটুকু আছে তা ধর্মীয় পরিচয়ে। এস সি-এস টি'রা অধিকাংশই হিন্দু আর ওবিসি'রা অধিকাংশই মুসলমান।দুর্ভাগ্যবশত, স্বাধীনতার সাড়ে সাত দশক পরে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গে মানুষের ধর্মীয় পরিচয়কে প্রাধান্য দিয়ে ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করছে বিচারালয়। বিচারের বাণী কি বৈষম্যমূলক হয়ে যাচ্ছে না? আদালত সাধারণ মানুষের ভরসার জায়গা।সেই জায়গা থেকেই বারবার ধাক্কা খেয়ে মানুষ আজ বিভ্রান্ত, বিপন্ন।

অপর আসন শিলং-এ জয়ী হয়েছেন ভয়েজ অফ দি পিপল পার্টির রিকি এ জে সিঙ্কম।

'নাগরিক' স্মৃতিচারণা ঃ

বিস্মৃত প্রকৃতিবিদ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য 'বাংলার কীটপতঙ্গ' বইটির জন্য রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত হন ১৯৭৫ সালে। ১৯৬৮ সালে আনন্দ পুরস্কার পান। রাতের অন্ধকারে, জঙ্গলে যে আগুন জ্বলতে দেখা যায়, তার রহস্য উৎঘাটন করে দেখেন সেটি আসলে জৈব আলো। একদিন অন্ধকার রাতে দুই বন্ধু মিলে গেলেন এক পুরানো পরিত্যক্ত ভিটায়। বৃষ্টি হচ্ছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই দেখলেন অস্পষ্ট আলো। আলোটার তীব্রতা নেই, কিছুটা নীলাভ। কাছে যেতেই দেখলেন পুরনো পচা একটা গাছের গুড়ি থেকে আলো নির্গত হচ্ছে। তিনি গাছের গোড়া থেকে কিছুটা অংশ সংগ্রহ করে নিয়ে এসে গবেষণা করেন। এরপর 'পচা গাছপালার আশ্চর্য আলো বিকিরণ করার ক্ষমতা' শিরোনামে একটা প্রবন্ধ লেখেন। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে 'প্রবাসীতে' পৌষ সংখ্যায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। লেখাটি চোখে পড়ে বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর। বিপ্লবী শ্রীপুলিনবিহারীকে বললেন গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যকে যেন তাঁর কাছে নিয়ে আসেন। বসু বিজ্ঞান মন্দির তখন নতুন চালু হয়েছে। ১৯২১ সালে জগদীশ চন্দ্রের সঙ্গে গোপাল ভট্টাচার্যের সাক্ষাত হয়। সেখানে তাঁকে ছোট পদে নিযুক্ত করা হয়। প্রথমে ছোট ছোট কাজ করতে দিলেন; যন্ত্রপাতি মেরামত, স্কেচ করা ইত্যাদি। অবশ্য খুব দ্রুতই তিনি তাঁর নিজস্ব প্রজেক্টে কাজ শুরু করেন। এরপর থেকে তিনি বসুর বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণার সুযোগ পান।

বিজ্ঞান মন্দিরে কাজ কর্ম সম্পর্কে বেশ কিছু দিন একটু ধারণা করার পর জগদীশ চন্দ্র বসুর দুজন সহকর্মীর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পান। তিনি তাঁদের কাজে সাহায্য করেন। কাজের ফলাফল প্রকাশ করার সময় ছবি দিতে হতো। গোপালচন্দ্র সেই ছবি আঁকতেন। এভাবে দুই বছর কাটার পর জগদীশ চন্দ্র বসু তাঁকে পারসপেকটিভ ড্রইং শিখবার জন্য গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে স্পেশাল ছাত্র হিসেবে ভর্তি করে দেন। তিনি দক্ষ ফটোগ্রাফারও হয়ে ওঠেন এবং নগেন্দ্রনাথ দাসের সঙ্গে ফটোগ্রাফিক কাজে জুটে গেলেন।

তারপর জগদীশ চন্দ্রের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি রক্ষনাবেক্ষণের জন্য ক্লাইভ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ছয় মাস শিক্ষা লাভ করেন। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করার মধ্য দিয়ে মাইক্রোস্কোপ নিয়ে কাজ শুরু করেন। বিচিত্র আকৃতি, প্রকৃতির প্রোটোজোয়া দেখে তিনি মুগ্ধ হন। উদ্ভিদ নিয়ে শুরু করলেও খুব কম সময়ে প্রোটোজোয়ায় এসে পরেন। তাঁর প্রথম গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত ১৯৩২ সালে গাছের কান্ডের স্থায়িত্ব নিয়ে। তারই ধারাবাহিকতায় জৈব আলো এবং উদ্ভিদ বিদ্যার উপর নিবন্ধ প্রকাশ পায়। ক্রমশ তার মনোযোগ কীটতত্ত্বের দিকে ধাবিত হয়।

কীটতত্ত্বের দিকে ধাবিত হওয়ার অন্য একটি কারণও আছে। একদিন কলমি ডাঁটার সেকশন কেটে পরীক্ষা করতে করতে দেখলেন সেই ডাঁটায় নতুন ধরনের কিছু কোষ উৎপন্ন হয়। কয়েক বার পরীক্ষাটা করে জগদীশ চন্দ্র বসুকে জানালেন। বসু প্রথমে তাঁকে একটি পেপার তৈরি করতে বললেন। কিন্তু পেপার তৈরি হলেও কিছু হয়নি বলে তিনি সেটা বাতিল করে দিলেন।এতে তিনি কিছুটা দমে গেলেন।

তাঁর কাজ নিয়ে বিশেষজ্ঞের মতামত নেয়ার জন্য কিছুটা মরিয়া হয়ে উঠলেন। উদ্ভিদ নয়, এবার তিনি কীটপতঙ্গ নিয়ে কাজ করলেন।

'আমেরিকার জাদুঘরের প্রকৃত ইতিহাস' সহ সব মিলিয়ে তাঁর ২২টির মতো নিবন্ধ ইংরেজিতে প্রকাশ পায়। ১৯৫১ সালে ভারতের সামাজিক পতঙ্গের উপরে নিবন্ধ পাঠের জন্য প্যারিসে অনুষ্ঠিত আর্ন্তজাতিক সভায় আমন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হলো সেখানে একাডেমিক শিক্ষাগত যোগ্যতার কারণে তাঁর সাথে পক্ষপাতিত্ব করা হয় এবং উপস্থিত বিজ্ঞানিরা তাঁর মতো সাধারণ একজনের সাথে আলোচনা করতে অস্বীকার করেন।

১৯৪০ সালের আগেই গোপালচন্দ্র ভট্টচার্য প্রকৃতিবিজ্ঞানী হিসেবে নিজেক প্রতিষ্ঠিত করেন। কলকাতার বসু ইনস্টিটিউটের কার্যাবলি নিয়ে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। সামাজিক পতঙ্গ যেমন পিঁপড়া, মৌমাছি ইত্যাদির রানী ও কর্মীরা কি ভাবে জন্মায়, তাদের প্রজনন, বেড়ে ওঠা ইত্যাদি গভীর পর্যবেক্ষণ সমৃদ্ধ আর্টিকেল লেখেন। তাঁর পরীক্ষণ মূলত ভারতীয় কীটপতঙ্গের উপর। তিনি অনেক ধৈর্য ধরে কাঁচের জারের ভেতরে পিঁপড়ার বাসা তৈরি করে তাদের উপর নজর রাখেন। মুকুল, কচিপাতা ইত্যাদি নানান রকমের খাবার সরবরাহ করে তাদের কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁর এই গবেষনায় প্রাপ্ত ফলাফল ১৯৪০ সালে জার্নালে প্রকাশ করেন কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের কারণে সেই ম্যাগাজিন তেমন প্রচার পায়নি।

তিনি দেখেছেন কিভাবে প্রাণী হাতিয়ার ব্যবহার করেন। বোলতা ছোট ছোট পাথর দিয়ে তাদের ঘরের দরজা বন্ধ করে। ত্রথন্দ্রন্তু নিজের ডিমকে রক্ষা করতে শত্রুর সামনের দুই হাত ব্যবহার করে মাটির ঢেলা ছুড়ে মারে। ঢেলা শেষ হয়ে গেলে খুব দ্রুত গতিতে মাটির বল তৈরি করে নেয়। প্রজননের সময় ছাড়া এমন আচরন আর কখনো দেখা যায় না। এই পর্যবেক্ষনটি করেন ১৯৪০ সালে। এই ব্যাপারে বাংলাতেই একটি নিবন্ধ লেখেন যুদ্ধের কারণে তা খুব বেশি প্রচারিত হয় নি। ১৯৪৮ সালে তিনি সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সাথে মিলে 'বাঙ্গালী বিজ্ঞান পরিষদ' নামে একটি বিজ্ঞান গবেষনা সমিতি গঠন করেন।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের জন্ম বৃহত্তর ফরিদপুরের শরীয়তপুর জেলার লোনসিং গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে। পিতা অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ ঘটে এবং গোপালচন্দ্রকে যজমানি করে পড়ার খরচ চালাতে হয়। লোনসিং হাইস্কুল থেকে ১৯১৩ সালে মেট্রিক পরীক্ষায় স্বর্ণপদক পান। ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে এফএ ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে বেশি দুর এগতে পারেননি। সাহিত্যেও আগ্রহী ছিলেন, লিখেছেন ছড়া, কবিতা, পালাগান। ছোটবেলা থেকেই তাঁর কীটপতঙ্গের জীবনধারার প্রতি ছিল অসীম কৌতুহল। পুলিনবিহারির মতো কয়েক জন বন্ধু মিলে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ১৯৫০ সালে বাঙ্গালী বিজ্ঞান পরিষদের ম্যাগাজিন 'বিজ্ঞান জানো'-র সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৭৭ সালে তিনি ওই ম্যাগাজিনের প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। বাংলা বিশ্বকোষ, ভারতকোষ সহ অনেক সংগঠনের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্যও তিনি কাজ করেন। 'করে দেখা' নামে তিন খন্ডের বই প্রকাশ করেন। তার কর্মজীবনে তিনি প্রায় এক হাজারের মতো বিজ্ঞান বিষয়ে আর্টিকেল লেখেন, যার বেশির ভাগই বাংলায় এবং তা প্রচুর জনপ্রিয়তাও পায়। ১৯৬৫ সালে অফিসিয়াল কাজ থেকে আবসর নেন কিন্তু কীটপতঙ্গ নিয়ে কাজ করা এবং লেখা লেখি অব্যহত রাখেন। তাঁর মৃত্যুর তিন মাস আগে কালকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে সম্মানস্বরুপ বিজ্ঞানে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করে। ওই বছরই তিনি বার্ধক্যজনিত কারণে পরোলোকগমন (৮ এপ্রিল, ১৯৮১) করেন।

(ফেসবুকের পাতা থেকে)

শ্রদ্ধাঞ্জলি ঃ

চলে গেলেন কলকাতাপ্রেমী পিটি নায়ার

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ বিশের দশকের প্রথম দিকে, ১৯৫৫ সালে কলকাতায় এসেছিলেন পরমেশ্বরন থনকপ্পন নায়ার।তিনি ডালহৌসি পাড়ায় টাইপিস্ট হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। পরে তিনি এই শহরের ইতিহাস নিয়ে ব্যাপকভাবে লিখেছেন এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি.লিট-এ সম্মানিত হয়েছিলেন। কলকাতার ইতিহাস ছাড়াও তিনি নানা বিষয়ে ৬১টি বইয়ের প্রণেতা। ১৯৬৪ সালে তৈরি রেমিংটন টাইপরাইটারে নায়ার তাঁর সমস্ত টাইপিং এর কাজ করেছিলেন। পুরনো দিনের কলকাতায় থাকতেন তিনি। ভবানীপুরের কাঁসারিপাড়া রোডে দু'কামরার ছোট্ট ফ্ল্যাটের একটা ঘরে হাফশার্ট ও লুঙ্গি পরেই কেটে যেত তাঁর দিন।

কলকাতায় ছয় দশকেরও বেশি সময় কাটিয়েছেন, বাঙালির শহরের সবচেয়ে বিখ্যাত 'বেয়ারফুট ইতিহাসবিদ' হিসেবে অধিক পরিচিতি তাঁর। কলকাতার পাশাপাশি তিনি প্রশংসিত মালয়ালম গবেষক এবং লেখক হিসাবেও। কলকাতার মানুষ না-হলেও কলকাতাকে ভালোবেসে নিজের বেশিরভাগ জীবনই কাটিয়েছিলেন। তবে, মৃত্যুকালে কেরালায় তাঁর নিজের গ্রামের বসতিই ছিল শেষ সম্বল, গত ১৮ জুন কেরালায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন পি. থঙ্কপ্পন নায়ার। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯১ বছর।

কাঁসারিটোলার ইন্টারনেট, টিভিহীন ছোট ফ্ল্যাটে অজস্র বইয়ের সঙ্গে একাই থাকতেন নায়ার। নিজে রান্না করতেন আর বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, বাড়িতে পড়াশোনা করতেন। গবেষণার কাজে কলকাতার রাস্তায় ঘুরতেন। স্ত্রী কেরলের স্কুলে পড়াতেন। উনিশ শতকের বাঙালি বিষয়ক গবেষক শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়কে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ''কলকাতায় অনেক নামজাদা ইতিহাসবিদ থাকলেও কলকাতার ইতিহাস লেখা হয়নি। এটা ভেবেই কলকাতার ইতিহাসে হাত দিই।'' নায়ারের বই 'এ হিস্ট্রি অফ ক্যালকাটাস স্ট্রীটস' তাঁর আরও জনপ্রিয় রচনাগুলির মধ্যে একটি। তিনি ছিলেন ইতিহাসবিদ, ঐতিহ্য বিশেষজ্ঞ এবং উত্সাহী লেখক। তিনি সরকারী আমলা আর কেরানিদের কাছ থেকেও তাঁর কাজে প্রচুর সাহায্য পেয়েছেন। কলকাতার দক্ষিণ ভারতীয়দের সম্পর্কে, কলকাতা পুলিশের উৎপত্তি এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রথম গ্রন্থাগারিক বিএস কেশবনের জীবনী লিখেছেন তিনি।

'বেয়ারফুট হিস্টরিয়ান অফ কলকাতা' নায়ার কলকাতাকে গভীর ভাবে ভালোবাসতেন। 'আ হিস্ট্রি অফ ক্যালকাটাজ স্ট্রিট্স' বইতে কলকাতাকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন। কলকাতার অলিগলি সবই ছিল তাঁর নখদর্পণে। রুটি-রুজির সন্ধানে কলকাতায় এসে এই শহরকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থেকে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার গল্পই হল তাঁর দীর্ঘ এবং সফল জীবনের গল্প। নায়ার কিন্তু কখনওই পেশাদার ইতিহাসবিদ ছিলেন না। পিটি নায়ারের কাছে, এই ব্যাপারে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাও ছিল না। টাইপিস্টের চাকরি করতে কলেজ পাস করেছেন। তাই বরাবরই অনেকেই তাঁকে নিছক তথ্য সংগ্রহক আখ্যা দিয়ে ইতিহাসবিদ মানতে নারাজ থাকেন। যদিও নায়ার এ ব্যাপারে বরাবরই উদাসীন ছিলেন। তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান গান্ধীবাদী। কেরালার গান্ধী স্মারক নিধি মালয়ালম ভাষায় তাঁর সম্পাদিত গান্ধীজির নির্বাচিত রচনা সাত খন্ডে প্রকাশ করেছে। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা ' গান্ধীজি ইন ক্যালকাটা।' ২০১৮ সালে, তিনি কলকাতা থেকে ফিরে যান নিজের জন্মস্থানে এবং নিজের শহর পারভুরে বসবাস শুরু করেছিলেন। নায়ারের পরিবারে, তাঁর স্ত্রী, ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছেন।

৭৫ বছরে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

জি কে সাদিক

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে ২০২৩ সালের ৬ মার্চ। বয়স হিসেবে ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল হিসেবে সিপিবি দেশটির সবচেয়ে প্রাচীন রাজনৈতিক সংগঠন। বাংলাদেশের জন্মের পেছনে ও জন্মের পরে দেশটির রাজনৈতিক লড়াই-সংগ্রামে, জনগণের অধিকার আদায়ের প্রশ্নে সিপিবির লাল পতাকা সবার আগে ছিল, এখনও আছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে কমিউনিস্ট পার্টি পাকিস্তান আমলে বা বাংলাদেশ আমলে কখনো এককভাবে বা জোটগতভাবে ক্ষমতায় যেতে না পারলেও পাকিস্তানের রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামে এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামে নীতি নির্ধারণী ভূমিকাও পালন করেছে।

পাকিস্তান আমলে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্ত ফ্রন্টের নির্বাচন, ১৯৬২ সালে শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালে ১১ দফা ভিত্তিক গণঅভ্যুত্থান এসব কিছুই ছিল কমিউনিস্ট পার্টির রূপরেখায় এবং তাদের ছাত্র গণসংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীদের সংগঠিত আন্দোলনের মাধ্যমে। বলতে গেলে বাংলাদেশের মানুষের অধিকার আদায়ের কোনও আন্দোলনই কমিউনিস্ট পার্টি বাদে হয়নি। তবে সামনের দিনে হবে কি না সেটা সময়ই বলে দেবে।

এমন সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের দল কমিউনিস্ট পার্টি যখন তার ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করলো তখন বাংলাদেশ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সামাজিকভাবে গভীর সংকটের সম্মুখীন। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সংকট হলো রাজনৈতিক সংকট। গণতান্ত্রিক যে রাজনীতি তা কার্যত এই মূহুর্তে বাংলাদেশে অনুপস্থিত। লন্ডনভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ইকনমিস্ট-এর ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের বৈশ্বিক গণতন্ত্র সূচক, ফ্রিডম হাউসের বৈশ্বিক গণতন্ত্র সূচক মতে বাংলাদেশ পূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশ তো নয়ই, বরং ত্রুটিপূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশও নয়। দেশটি 'হাইব্রিড রেজিম'ভুক্ত দেশের তালিকায় রয়েছে। যেখানে রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, আইন-আদালত-বিচার বিভাগ, সংবাদমাধ্যম, নির্বাচন কমিশন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী দলীয়করণ হয়েছে।

সংবাদমাধ্যম স্বাধীন নয়। কাগজে-কলমে গণতান্ত্রিক দেশ হলেও গণতন্ত্র এখানে কার্যত প্রাতিষ্ঠানিক ফরমেশনে বা রাজনৈতিকভাবে আর চর্চা হচ্ছে না। ২০১৪ সালের দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশটিতে জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এসবের বিরুদ্ধে সিপিবিও আন্দোলন করছে। দলটি বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ফ্যাসিবাদী শাসন বলে আখ্যা দিচ্ছে। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে, সিপিবি বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ফ্যাসিবাদী শাসন বললেও দিন শেষে কার্যকর কোনো ভূমিকা পালন করতে পারছে না। হতে পারে তারা কোনো ভূমিকা পালন করছে না। এমনকি ভবিষ্যতে কার্যকর কোনো ভূমিকা পালন করতে পারবে বলেও কোনো সম্ভবনা অন্তত দেখাতে পারছে না। বলতে গেলে ৭৫ বছর বয়সে এসে সিপিবি এক বুড়ো হাতিতে পরিণত হয়েছে। দলটি এগিয়ে চলছে এক অনিশ্চিত রাজনৈতিক গন্তব্যের দিকে।

বাংলাদেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক সংকটময় পরিস্থিতিতে যেখানে বামপন্থী দলগুলোকে একত্রিত করে সিপিবির নেতৃত্বে বাম শক্তির উত্থান ছিল সময়ের দাবি সেখানে বতর্মান ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ ও মাঠের বিরোধী দল বিএনপির রাজনৈতিক বাইনারিতে সিপিবিসহ অন্যান্য বামপন্থী দলগুলোর আন্দোলন-সংগ্রাম রাজনীতির মাঠে জনগণের মাঝে তেমন কোনো প্রভাব ফেলতে পারছে না। বর্তমানে সিপিবিসহ অন্যান্য বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো জুবুথুবু কাঠামোগতভাবে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারলেও অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। স্রোত-প্রবাহহীন এক বদ্ধ খালে পরিণত হয়েছে। নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে বের হতে পারছে না। বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক সংকটময় পরিস্থিতি চলছে তার সমাধানকল্পে সিপিবিসহ অন্যান্য বামপন্থী দলগুলো সেখানে জনগণের সামনে সুনির্দিষ্ট কোনো রূপরেখা তুলে ধরতে এখন

পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। দেশটির রাজনৈতিক সংকটের সময়ে সিপিবি বা বামপন্থী দলগুলোর কাছে তেমন রূপরেখা কাম্য ছিল। সিপিবি সেই আশা পূরণ করতে পারেনি। বরং হয়েছে উল্টো। সিপিবি যে ধরনের রাজনৈতিক বন্দোবস্ত, সরকার ও সাংবিধানিক সংস্কারের কথা বলে এসেছে ঠিক তেমনটা না হলেও তার কাছাকাছি একটি রূপরেখা দিয়েছে মাঠের বিরোধী দল, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রধান প্রতিপক্ষ বিএনপি। রাজনৈতিক মেরিটের জায়গায় সিপিবি যেখানে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারতো সেখানে তারা পিছিয়ে গিয়েছে বলতেই হয়। এই বলাটা ভুলও নয়। ফলে বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সিপিবির ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী কেবলই দলীয় রুটিন ওয়ার্কের বাইরে দেশের মানুষের কাছে তেমন কোনো আবেদন রাখে না।

ইতিহাসের সাক্ষ্য হচ্ছে, যখনই বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন ইতিহাসের সূচনার মুর্হূত এসেছে তখন সিপিবি অভ্যন্তরীণ কোন্দলে পরে বিভক্ত হয়েছে আর নয়তো ভুল রাজনৈতিক লাইন নিয়েছে। গত শতকে ষাটের দশকে যখন বাংলাদেশে পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলন শুরু হয় তখন ১৯৬৫ সালে চীন-রাশিয়ার দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে সিপিবি দুই ভাগে বিভক্ত হয়। সিপিবির এই ভাঙনের শিকার হয় তার বিভিন্ন গণসংগঠনগুলোও। সে সময় সিপিবির ভাঙনের শিকার হয় বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন বামপন্থী ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল নেতৃত্বের জায়গা থেকে ছিটকে যায় অত্যন্ত সুসংগঠিত এই ছাত্র সংগঠনটি। একইভাবে ১৯৯১ সালেও যখন স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক ধারার নতুন বন্দোবস্ত হচ্ছিল তখন আরেকবার ভাঙনের শিকার হয় সিপিবি। সেই জের পরে তার অন্যান্য গণসংগঠনেও। সে সময় ছাত্র ইউনিয়নও আরেকবার ভাঙনের শিকার হয়।

এখন যখন বাংলাদেশের রাজনীতি-অর্থনীতি, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার পরিস্থিতি গভীর সংকটে তখন সিপিবি ম্রিয়মাণ রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হয়েছে। ২০২২ সালে অনুষ্ঠিত সিপিবির দ্বাদশ জাতীয় কংগ্রেস ঘিরে দলটিতে আবারও ভাঙনের গুঞ্জন উঠেছিল। তবে শেষ পর্যন্ত ভাঙন এড়াতে পারলেও দলটির অভ্যন্তরীণ কোন্দল চরম আকার ধারণ করেছে। সিপিবির অভ্যন্তরীণ কোন্দল শেষ পর্যন্ত ভাঙন পর্যন্ত না গড়ালেও দলটির ছাত্র গণসংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন, গার্মেন্টস শ্রমিকদের সংগঠন ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রসহ (টিইউসি) অন্যান্য গণসংগঠনেও কোন্দল ব্যাপক মাত্রায় ছড়িয়েছে।

বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন বামপন্থী ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন এখন পর্যন্ত তার ৭১ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সংকটের মুখোমুখী। বর্তমানে ছাত্র ইউনিয়নের কোনো কেন্দ্রীয় কমিটির অস্তিত্ব নেই। এর মূল কারণ হচ্ছে, সিপিবির অভ্যন্তরে দুই অংশের প্রভাবে ছাত্র ইউনিয়নও দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পরেছে। এই বিভক্তি প্রকাশ্যে আসে ২০২০ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত ছাত্র ইউনিয়নের ৪০তম জাতীয় সম্মেলন ও কাউন্সিলের পর। সেই কাউন্সিলের পর ছাত্র ইউনিয়নের দুটি কমিটি হয়। ৭১ বছরের ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো ভাগ হয়ে যায় ছাত্র ইউনিয়ন। দীর্ঘ প্রায় আড়াই বছর বিভক্ত থাকার পর সিপিবির নেতৃত্বের পক্ষ থেকে ছাত্র ইউনিয়নকে একত্রিত করার উদ্যোগ নেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত তা সফল হয়নি। পরে ছাত্র ইউনিয়নের বিবাদমান দুই অংশকে একত্রিত করে ৪১তম জাতীয় কাউন্সিল শুরু হয়। কিন্তু দুই অংশের দ্বন্দ্বের নিরসন না হওয়ায় নতুন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নির্বাচন না করেই ৪১তম জাতীয় কাউন্সিল অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়। ফলে ছাত্র ইউনিয়নকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সিপিবির যে প্রচেষ্টা তা এক রকম মুখ থুবড়ে পড়েছে।

একইভাবে সিপিবি রাজনৈতিক সংকটের মুর্হূতে ভুল রাজনৈতিক লাইন নির্ধারণ করেছে। যদিও পরবর্তীতে সিপিবির নেতৃত্ব সেই ভুল সিদ্ধান্তের কথা স্বীকারও করেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সিপিবির নেতৃত্ব আওয়ামী লীগের সাথে ঐক্য করে। তখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ।

মাঠে তেমন কোনো বিরোধী দল ছিল না। মওলানা ভাসানী ছিলেন সুপরিচিত ও মোটামুটি জনসম্পৃক্ত একমাত্র বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তবে রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) ততদিনে কয়েকবার ভাঙনের শিকার হয়ে ম্রিয়মান হয়ে গেছে। অনেকেই তাকে ছেড়ে চলে গেছে। ফলে স্বাধীন বাংলাদেশে মুজিব সরকারের সামনে শক্তিশালী কোনো বিরোধী দল ছিল না। সে সময় সিপিবি সরকারি দলের সাথে ঐক্য না করে মাঠে বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করতে পরতো। তাতে যেমন সরকার রাজনৈতিকভাবে দক্ষ বিরোধী দল পেত এবং তা সদ্য স্বাধীন দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করত। কিন্তু সে সময় সিপিবির নেতৃত্ব সেই ভূমিকা পালন করতে পারেনি। ফলে যারা মুজিব সরকারকে পছন্দ করতো না বা আওয়ামী লীগকে পছন্দ করতো না কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, স্বাধীন দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় তখন তারা এক রকম রাজনৈতিক গন্তব্যহীন হয়ে পরে।

তখন ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ ভেঙে একটি অংশ বের হয়ে গিয়ে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) গঠন করে। জাসদ ছিল ছাত্রলীগের সমাজতন্ত্রপন্থী অংশের দল। সদ্য ছাত্র রাজনীতি শেষ করে আসা চোখে-মুখে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে গঠিত তরুণ রাজনৈতিক নেতাদের দল জাসদ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার অভাবে ও হটকারী সিদ্ধান্তের ফলে ব্যাপক জন সম্পৃক্ততা লাভের পরও সরকার বিরোধী রাজনীতিতে বিরোধী দল হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়। এছাড়া তখন মুজিব সরকারের ব্যাপক দমন-পীড়নের মুখে জাসদ এক রকম নিষিদ্ধ দলের মতো হয়ে যায়। দলটি আন্ডারগ্রাউন্ড দলে পরিণত হয়। এরপর আর দলটি ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। ভাঙনে ভাঙনে এখন আসল জাসদ খুঁজে পাওয়া দুস্কর।

সিপিবির নেতৃত্বের ভুল রাজনৈতিক লাইনের ফলে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের কার্যকর কোনো বিরোধী দল গড়ে উঠেনি। কার্যকর বিরোধী দল না থাকায় দেশে গণতান্ত্রিক রাজনীতির বিকাশও হয়নি। বরং যে সকল তরুণ ছাত্র-যুবা সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখেছিল তারা মাঠে তেমন কোনো সমাজতান্ত্রিক দলের উপস্থিতি না পেয়ে জাসদে ভীড় জমায়। কিন্তু জাসদ নেতৃত্ব সেই তরুণ ছাত্র-যুবাদের আকাঙ্খা পুরনো ব্যর্থ হয়। সদ্য স্বাধীন দেশে সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখা তরুণদের মাঝে হতাশা-ব্যর্থতা ভর করে। একইভাবে ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন আওয়ামী লীগসহ দেশের সব রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠন করেন, তখন সিপিবি নেতৃত্বও সেই বাকশালে নিজেদের দল বিলুপ্ত ঘোষণা করে অংশগ্রহণ করেন। যদিও বর্তমান সিপিবির নেতৃত্ব দাবি করে তারা প্রকাশ্যে দল বিলুপ্ত ঘোষণা করলেও গোপনে দলের অস্তিত্ব রেখেছিলেন। তবে সেই সময়ে বাকশাল যে ভুল পদক্ষেপ ছিল সেটাও তাঁরা স্বীকার করেন।

একইভাবে বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট সমাধানে সিপিবির নেতৃত্ব সঠিক রাজনৈতিক লাইন নিয়ে জনগণের কাছে তাদের অবস্থান তুলে ধরতে পারছেন না। ফলে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও মাঠের বিরোধী দল বিএনপির যে দ্বি-দলীয় রাজনীতি তার বাইরে সিপিবি নিজের কোনো অবস্থান জনগণের মাঝে জানান দিতে পারছে না। ৭৫ বছরে তাহলে সিপিবি কী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যহীন নয়? আগামী দিনে সিপিবির রাজনৈতিক গন্তব্য কী সেটাও তার কর্মীদের সামনে স্পষ্ট নয়।

(২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কয়েক মাস আগের এ লেখা পিপলস রিপোর্টার-এ ২৭ মার্চ ২০২৩ এ প্রকাশিত।)

নবাব সিরাজদ্দৌলা ও পলাশী লুণ্ঠন

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলা পরাস্ত হন।বন্দী নবাবকে ৩ জুলাই হত্যা করা হয়। বিদেশি ঐতিহাসিকরা নবাব সিরাজদ্দৌলার চরিত্র বিকৃত বর্ণে চিত্রিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে নবাব সিরাজদ্দৌলা ছিলেন একজন উদার, অসাম্প্রদায়িক ও প্রজাবৎসল স্বাধীন নবাব।

নবাব সিরাজদ্দৌলা পলাশির প্রান্তরে ইংরেজদের সাথে যে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন তা প্রকৃতপক্ষে কোনও যুদ্ধ নয়। যুদ্ধের নামে প্রহসন। এটি ছিল একধরনের মারামারি (skirmish) মাত্র। এটি ছিল এক জঘন্য ষড়যন্ত্র প্রসূত যুদ্ধের নামে নাটক। কিন্তু পলাশির যুদ্ধের কথা যখনই সামনে আসে আমাদের ছাত্রদের মাথায় প্রথমেই ঢুকিয়ে দেওয়া হয় নবাব সিরাজ ছিলেন একজন চরিত্রহীন মদ্যপ। ইংরেজ ঐতিহাসিকদের সেই বর্ণনা আমরা আজও শিরোধার্য করে ইতিহাস পাঠ করি। মনে করা হয় পলাশির যুদ্ধের প্রধান কারণ ছিল সিরাজদ্দৌলার চরিত্র সংশোধন। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোনও অপরাধ ছিল না। নবাব সিরাজ যেন একাই মদ পান করতেন। মনে হয় জগৎ শেঠ,মাহতাব চাঁদ, মহারাজা স্বরূপ চাঁদ, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা রাজবল্লভ, নন্দকুমার, উমি চাঁদ, রায় দুর্লভ, ইয়ার লতিফ, মীরজাফর মদ স্পর্শ করতেন না। রবার্ট ক্লাইভ, ওয়াটসন, রজার ড্রেক, লুক স্ক্রেফটন, জন ওয়ালশ এঁরা যেন জীবনে মদ চোখে দেখেনি।বরং নবাব হওয়ার পর সিরাজদ্দৌলার চরিত্রের নিন্দাসূচক দিকের কোনও প্রমাণ শত্রু পক্ষও খুঁজে পায়নি।তনিন্দাসূচক এমন কোনও প্রত্যক্ষ তথ্য বা নিদর্শন পাওয়া দুষ্করদ। প্রকৃতপক্ষে নবাব সিরাজদ্দৌলা ছিলেন দেশপ্রেমিক, বাকি ষড়যন্ত্রকারীরা ছিল দেশদ্রোহী এবং ইংরেজরা ছিল বহিশত্রু।

সিরাজদ্দৌলা ১৭৫৬ সালের ১৫ এপ্রিল বাংলার নবাব হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। নবীন নবাব বুঝতে পেরেছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দুরভিসন্ধি। ইংরেজদের কতকগুলি কাজ নবাব দেশ বিরোধী বলে মনে করতেন।

১) ইংরেজরা দেশের কোনও আইনকানুন না মেনে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কেল্লাকে অনুমতি ব্যতীত দুর্ভেদ্য দুর্গরূপে তৈরি করছে। ২) তারা দস্তক বা বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি পত্র জ্বাল ও অপব্যবহার করছে। ৩) নবাবকে অগ্রাহ্য করে অপরাধী কৃষ্ণদাসের মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ইংরেজ কলকাতায় আশ্রয় দিচ্ছে ও অপরাধে প্রশ্রয় দিচ্ছে।

নবাবের এই সমস্ত অভিযোগ গুলি ছিল যথেষ্ট বাস্তব ও ন্যায় সঙ্গত। তাই তিনি লিখিত ভাবে ইংরেজদের এই কাজ করতে নিষেধ করেন। দুর্গের প্রাচীর ভেঙে ফেলতে নির্দেশ দেন। কৃষ্ণদাসকে তাঁর হাতে সমর্পণের দাবি করেন।নবাবের বিশেষ দূত নারায়ণ সিংহ এই নির্দেশ নিয়ে গেলে গভর্নর রজার ড্রেক তাঁকে চরম অপমান করেন। ফলে নবাব কলকাতা আক্রমণ করেন ও ইংরেজদের পরাজিত করে কলকাতা দখল করেন। পরে মাদ্রাজ হতে রবার্ট ক্লাইভ ও এডমিরাল ওয়াটসন অধীনে একদল ব্রিটিশ সৈনিক বাংলায় আসে ও ১৭৫৭ সালে জানুয়ারি মাসে কলকাতা পুনরুদ্ধার করে। সিরাজদ্দৌলা শুধু যে সামরিক অভিযান চালিয়েছিলেন তাই নয়,তাঁর কূটনৈতিক সাফল্যও উল্লেখ করার মতো। তাঁর মসনদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ও দাবিদার ছিলেন তাঁর মাসী ঘসেটি বেগম ও তাঁর পুত্র শওকত জং। বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা ও কূটনৈতিক পদক্ষেপের দ্বারা তিনি সে সমস্যার মোকাবিলা করেন সাফল্যের সাথে। তাঁর পনেরো মাসের রাজত্ব কালে তাঁর অপরিণত বুদ্ধি, পাগলামি বা নির্দয় ব্যবহারের কোনও নজির নেই।

পলাশির যুদ্ধের এক সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আছে। ভারতে মুঘল শাসনের সব ফরমানেই বাংলাকে ভারতবর্ষের স্বর্গ বলে উল্লেখ করা হত। প্রাক পলাশির সময়ের কথা বলতে গিয়ে ঐতিহাসিক ডো বলেন, ত্বাংলা ছিল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সম্পদশালী ও জনবহুল দেশ। এখানকার কৃষিব্যবস্থা ছিল সর্বোৎকৃষ্ট। একদিকে সমাজের উঁচুস্তরের লোকজন ও বণিক সম্প্রদায় প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী। অন্যদিকে সাধারণ কৃষক ও কারিগরেরাও প্রাচুর্য ও সুখশান্তিতে

জীবনযাপন করছিল। বাংলার নবাবরা দেশের নাড়িনক্ষত্র জানতেন। তাঁরা শাসনযন্ত্রের মাধ্যমে অত্যাচারী হয়ে ওঠেন নি।দ নবাব সিরাজদ্দৌলাকে কেউ কোনও দিন প্রজা নির্যাতনকারী বলতে পারেননি। নবাব ছিলেন উদার। সিরাজের সময় অধিকাংশ উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন হিন্দু। তরুণ নবাবের সবচেয়ে আস্থাভাজন ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন মোহনলাল। সিরাজদ্দৌলা ইংরেজদের সাথে আলিনগর চুক্তি (১৭৫৭ ফেব্রুয়ারি) সম্পাদন করে মুর্শিদাবাদ ফিরে তাঁর প্রাসাদে হোলি উৎসবে যোগ দেন।

কিন্তু নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে দরবারের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের একটি অংশ গেলেন কেন, সে কি নবাবের মদ্য পানের কারণে? এই বিরুদ্ধ গোষ্ঠীতে ছিলেন ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কার, জমিদার ও অভিজাত সেনানায়করাও। এই দুর্নীতিপরায়ণ গোষ্ঠী আশঙ্কা করেছিলেন যে তরুণ নবাব তাঁদের অপকর্ম বরদাস্ত করবেন না। অর্থাৎ নবাব সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ছিল যে নবাব ছিলেন সৎ ও সাহসী। জগৎ শেঠ ছিলেন টাঁকশালের একচ্ছত্র অধিকারী। পুরনো মুদ্রা নতুন মুদ্রায় পরিবর্তন করা , রাজস্ব আদায় করা এবং সবই ছিল তাঁর দুর্নীতিপূর্ণ। উমিচাঁদের ছিল সোরা, শস্য ও আফিং এর একচেটিয়া কারবার। খোজা ওয়াজিদের ছিল লবন ও সোরার বেআইনি কারবার। তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন যে নবাব তাঁদের অন্যায় সমর্থন করবেন না। মীরজাফর, রায়দুর্লভ ও ইয়ার লতিফের মতো অভিজাত সেনানায়করা যাঁরা প্রভুত ক্ষমতা ও অর্থের অধিকারী ছিলেন, তাঁরা বিলক্ষণ বুঝে ছিলেন যে তাঁদের অনুকূল কায়েমি স্বার্থ এবার ব্যাহত হবে। তরুণ নবাব এসবের আমূল পরিবর্তন করবেন। প্রথমে লোভী ইয়ার লতিফ নবাব হওয়ার প্রস্তাব পায়। পরে মীরজাফরকে নবাব করার চূড়ান্ত ষড়যন্ত্র তৈরি হয়। অন্যদিকে ইংরেজদের নবাবের বিরুদ্ধে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায় ছিল না, কারণ তারা ভারতকে শোষণ করার জন্য পরিকল্পনা করছে । অন্যায় ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়া তাদের লুট করা অসম্ভব। কিন্তু নবাব তাদের শোষণ করতে দেবেন না বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সুতরাং ইংরেজরা চায় নবাবকে অপসারণ করতে। অথচ নবাব সিরাজদ্দৌলা ইংরেজদের পাওয়া বাদশাহী বাণিজ্য সনদ বাতিল করতে চান নি। তিনি ছিলেন এতটাই ন্যায়পরায়ণ ।

পলাশির প্রান্তর ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন সাক্ষী থাকল কিভাবে যুদ্ধের নামে প্রহসন করে দেশকে বিদেশের হাতে তুলে দেওয়া হল ।সকাল ৮টার সময় যুদ্ধ শুরু হয়। মীরমদন, মোহনলাল, খাজা আব্দুল হাদি খান, নবসিং হাজারী প্রমুখের অধীন নবাব বাহিনী বীর বিক্রমে যুদ্ধ শুরু করেন। অন্যদিকে মীরজাফর, ইয়ার লতিফ, রায় দুর্লভের অধীন নবাবের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ সেনা নিষ্ক্রিয় ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। তবু প্রথম দিকের যুদ্ধের তীব্রতা দেখে ক্লাইভ রাতের অন্ধকারে কলকাতা পালিয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করেন। এমন সময় কামানের গোলায় মীরমদন শহিদ হন । এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মুহূর্তে মীরজাফর ষড়যন্ত্র মাফিক যুদ্ধ থামিয়ে দেন। ইংরেজ বাহিনী সুযোগ বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বেলা তিনটের সময় যুদ্ধ শেষ। নবাব পরাজিত। ভারতের স্বাধীনতা অস্তমিত। একজন সৎ সাহসী দেশপ্রেমী প্রজাবৎসল নবাবকে ষড়যন্ত্র করে পরাজিত করা হল। পরাজিত হল ভারত । একজন ইংরেজ সৈনিক উড বলেছিলেন, এই সেই বিশিষ্ট ও চূড়ান্ত যুদ্ধ যেখানে কোনও ব্যাপক আক্রমণ ছাড়াই রাজ্য জয় করা হয়। ঐতিহাসিকদের মতে নবাব সিরাজদ্দৌলা সামরিক ভাবে পরাজিত হননি, পরাজিত হয়েছিলেন ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে। তবু এই ভাগ্যতাড়িত নবাব সিরাজদ্দৌলা কলঙ্কের হাত হতে রেহাই পান না সেই ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের কারণেই। সিরাজের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করে কলকাতায় একটি মনুমেন্ট তৈরি করা হয়েছিল। তার নাম ছিল 'হলওয়েল মনুমেন্ট '। ইংরেজরা প্রচার করেছিল কলকাতা জয় করে নবাব নাকি একটি ক্ষুদ্র কক্ষে শতাধিক নারী-পুরুষ-শিশুকে আটকে রাখায় তারা সবাই মারা যায়। এর নাম দেয় তারা 'অন্ধকূপ হত্যা' বা 'Black hole tragedy' । তার স্মারক হিসেবে তারা Writers Buildings এর পশ্চিম দিকে ওই মনুমেন্ট বসিয়েছিল। কিন্তু অন্ধকূপ হত্যার কাহিনি ছিল সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা ও ইংরেজদের প্রোপাগান্ডা।

পরবর্তী কালে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ৩রা জুলাই ১৯৪০ এ হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের জন্য সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ডাক দেন। বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানেরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করে ইংরেজদের বাধ্য করে ঐ হলওয়েল

মনুমেন্ট তুলে নিতে। ওই মনুমেন্টটি এখন কলকাতায় সেন্ট জন চার্চের মধ্যে রাখা আছে । তার আগে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্যোগে ২৩শে জুন,১৯৪০ এ প্রথম 'পলাশি দিবস' উদযাপন করা হয়েছিল কলকাতায়।সঙ্গে ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর রচিত নাটকের ভূমিকায় বলেন, বিদেশি ইতিহাসে সিরাজ চরিত্র বিকৃত বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বিহারীলাল সরকার, নিখিলনাথ রায়, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিক্ষিত সুধী অসাধারণ অধ্যাবসায় সহকারে বিদেশি ইতিহাস খণ্ডন করিয়া রাজনৈতিক ও প্রজাবৎসল সিরাজের স্বরূপ চিত্র প্রদর্শনে যত্নশীল হন। আমি ওই সমস্ত লেখকগণের নিকট ঋণী। সিরাজদ্দৌলা আমাদের অহঙ্কার ও ভালোবাসা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নবাব সিরাজদ্দৌলা সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন, সেই করুণ মহা নাটকের প্রধান অভিনেতাদের মধ্যে সিরাজদ্দৌলাই একমাত্র লোক যিনি প্রতারণা করিবার চেষ্টা করেন নাই।

ইদানিং নির্বাচনকে সামনে রেখে সাম্প্রদায়িক শক্তি নবাব সিরাজদ্দৌলা সম্পর্কে চরম সাম্প্রদায়িক প্রচার শুরু করেছিল। কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়, যিনি কৃষ্ণনগর রাজ্য পরিবারের বধূমাতা , তিনি বলেছেন ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে যদি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে সিরাজদ্দৌলা পরাস্ত না হতেন, তাহলে নাকি সনাতন ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যেতো। কারণ উনি খুবই অত্যাচারী ও দুর্নীতিগ্রস্ত ছিলেন। ব্রিটিশ বণিকদের সঙ্গে এই চক্রান্তে যদি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, জগৎ শেঠ, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ প্রমুখ যোগ না দিতেন তাহলে নাকি আমাদের ভাষা, পোশাক পরিচ্ছদ সব অন্য রকম হয়ে যেত। কী অসাধারণ ইতিহাসবোধ। উনি অবশ্য এই চক্রান্তে যে মিরজাফর, ইয়ার লতিফ খান, মিরণ প্রমুখ জড়িত ছিলেন তা আর উল্লেখ করেন নি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এই চক্রান্তের সমর্থক কোনও ঐতিহাসিকও পলাশীর যুদ্ধকে হিন্দু - মুসলমান দ্বন্দ্ব বলে উল্লেখ করেননি। প্রকৃত পক্ষে এই যুদ্ধ ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের সঙ্গে ভারতীয় জনসাধারণের দ্বন্দ্ব। এই প্রার্থীর সঙ্গে কথোপকথনের সময় আমাদের প্রধানমন্ত্রী অনবদ্য ইতিহাস জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। উনি বলেছেন তাঁদের নাকি স্কুলের ইতিহাসে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সমাজ সংস্কারের কথা পড়ানো হত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্ভবত রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে কৃষ্ণ চন্দ্রকে গুলিয়ে ফেলেছেন।

কৃষ্ণচন্দ্র কবে সমাজ সংস্কারক ছিলেন? দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায়ের ' ক্ষিতিশ বংশাবলী' থেকে জানা যায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন একজন গোঁড়া রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ।

পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল এই যুদ্ধের পরবর্তী ২০ বছর ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় যে অবাধ লুণ্ঠন চালিয়েছিল ইতিহাসে তাকে Plassey Plunder (পলাশী লুণ্ঠন) বলা হয়। ওই লুঠের টাকাই ইংল্যান্ড - এর শিল্প বিপ্লবের পুঁজি ছিল। ঐতিহাসিক স্পিয়ার এই লুঠ সম্পর্কে বলেছেন ' The welfare state has become a plunderous state.' (একটি কল্যাণ মূলক রাষ্ট্র পরিণত হল একটি লুণ্ঠন মূলক রাষ্ট্রে)

পলাশীর যুদ্ধের পর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসন ক্ষমতা হস্তগত করে। তাদের লুণ্ঠন ও অত্যাচারের ফলে ইং ১৭৭০ , বাংলা ১১৭৬ সনে ভয়াবহ 'অভিশপ্ত ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ' ঘটে।ওই দুর্ভিক্ষে ১.৫০ কোটির বেশি মানুষ মারা যায়।

৩ জুলাই নবাব সিরাজদ্দৌলার শহিদত্ব বরণের দিন। তিনি বাঙালি নন। কিন্তু তাঁর পূর্বপুরুষরা এদেশেই থেকে যান। অন্য বহু রাজা বা নবাব পরিবারের মতন ইংরেজদের সঙ্গে আপোষ করে তিনি ওই বহিঃশত্রুদের আশ্রিত নবাব হিসেবে থেকে যেতে পারতেন। তা তিনি করেন নি। এই জন্যই তিনি ইতিহাসের ট্র্যাজিক নায়ক হয়ে থাকবেন।

ঋণ

১) পলাশির অজানা কাহিনী - সুশীল চৌধুরী
২) সিরাজদ্দৌলা- অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়।
৩) পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ - রজত কান্ত রায়